Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 2	Place of Publication: Sundaram Prakashani, 54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.
Collection: Indrajit Chaudhury, A.B.P. House, Kolkata / Ashok Sen, 98 S. P. Mukherjee Rd.; Kolkata:700028	Publisher: Subho Thakur.
Title: *Sundaram* (Bengali monthly art magazine)	Year of Publication: Year 1, No.1, *Sravana*, 1363 B.S (1956) – Year 4, No. 3 - 12, 1367 B.S. (1960).
	Size (l. x b.): 23c.m. x 17c.m.
Editor: Subho Thakur (03. 01. 1912 – 17. 07. 1985).	Condition: O.K. / Good. Cover page of *Sundaram* 2nd yr, no. 3 is partially torn.
	Remarks: Single volumes with advertisements; Sequence of page numbers may break as cover pages, title pages, content lists are not included in the numbered pages of the book.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

নন্দন

চিত্র, কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্র

সম্পাদক
সুভো ঠাকুর

লেখক
প্রেমেন্দ্র মিত্র
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
অশোক মিত্র
বিনয় ঘোষ
আশু চট্টোপাধ্যায়
বিশুনাথ চৌধুরী
অসীম সোম
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত
অমল মিত্র
শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়
রঘুনাথ গোস্বামী
জি, ভেঙ্কটাচলম
অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
বিনয়েন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
দেবনাথ মুখোপাধ্যায়
নীলকণ্ঠ

মূল্য
দু টাকা

পূজার মিছিল
এই প্রচ্ছদচিত্রটি
সুভো ঠাকুর অঙ্কিত একটি
চিত্রের প্রতিলিপি

ART and BEAUTY

- PAINTINGS
- BED COVERS
- SAREES
- SCARVES
- GARMENTS
- CURTAINS
- DRESS MATERIALS
- GREETING CARDS
- FLOWER VASES
- CALENDARS
- BAMBOO SCREENS

ETC. ETC.

DESIGNED & PRODUCED

AT

UDAY-VILLA

THE WOMEN'S CO-OPERATIVE INDUSTRIAL HOME LTD.

UDAY-VILLA • KAMARHATI • 24 PARGANAS • PHONE : PANIHATI 266

তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পরিক্রমা—৩৲

(রম্যরচনা)

"পরিক্রমা বইখানি যে একখানি বিশেষ সুপাঠ্য বই, সে কথা সানন্দে প্রকাশ করছি।"

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

"খাসা লিখেছেন। বলার ঢং, বাংলার ভাষা, বাংলার বিষয় সবই মোগলাই বা মজলিসী···। ···'পরিক্রমা' সার্থক রচনা হয়েছে।"

—অন্নদাশঙ্কর রায়

"আশা করি 'পরিক্রমার' অনেক পাঠক হবে।"

—রাজশেখর বসু

"···বুদ্ধির দীপ্তি এবং কৌতুকের ছটায় বইখানি ঝলমল করছে। রমনীয় রচনা হিসাবে 'পরিক্রমা' নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্যতার পর্য্যায়ে পড়ে।"

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

"···সাহিত্যের ইতিহাসে এই ঐতিহাসিক 'পরিক্রমা' আরব্য উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকবে চিরদিন।"

--নরেন্দ্র দেব

"···A very welcome book is "Parikrama" by Tulshi Prosad Banerjee."

Dr. Kalidas Nag

এমিলজোলার

বহ্নি—৩৷৹

(Pof. Bouille-এর অনুবাদ)

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্যারিসের এক অতি-বাস্তব আখ্যায়িকা।

এমিলজোলার

বৈদেহী—৩৷৹

(La honle বা লজ্জার অনুবাদ)

"···বাংলার অনুবাদ সাহিত্যে 'বৈদেহী' একটি অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল।"

--নরেন্দ্র দেব

"···এই বইখানি সুখপাঠ্য প্রাঞ্জল বাংলায় লিখিত হইয়াছে, এবং আশা করি ইহা বাঙ্গালী পাঠকের নিকট সাদরে গৃহীত হইবে।"

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

"···আর একটি উল্লেখযোগ্য বিদেশী গ্রন্থ জোলার La honle-এর স্বচ্ছ-সুন্দর অনুবাদ 'বৈদেহী' ···।"

ডাঃ কালিদাস নাগ

"···নারীর গভীরতম জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বের অন্তস্থলে ডুব দেওয়ার সামর্থে এমিল-জোলা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আজও মনে হয় যেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী···।"

—সুভো ঠাকুর

I have read Zola in the original and the translation of 'La honle in my opinion has been done in a very fine and minute manner.

--Pahari Sanyal

এমিলজোলার

রেণীর প্রেম—৪৲

(La Curee-র অনুবাদ)

জীবনের দাবী বড় না সংস্কারের দাবী বড়? কি সে চিরন্তন পিয়াস যা সমাজ মানে না, সংস্কার মানে না, বয়স মানে না, সম্পর্ক মানে না!

কিরোর

হাতের গোপন কথা—৩৲

"বিশ্ববিশ্রুত কিরোর Secrets of the hands-এর রমণীয় বাংলা অনুবাদ আগ্রহশীল পাঠকমাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করবে। সরল রেখাঙ্কনগুলি বিষয়বস্তুর অনুধাবনে বিশেষ সাহায্য করে।···"

ডাঃ কালিদাস নাগ

এই গ্রন্থখানি তাঁরই একখানি অপেক্ষা-কৃত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য রচিত। হস্তরেখা সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষার সোপান-স্বরূপ। সহজভাবে সাধারণের জন্য এই গ্রন্থ লিখিত। কিরোর মুখবন্ধটিও এই গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বঙ্গানুবাদ ভাল হয়েছে।

—দৈনিক বসুমতী

একজন পাঠকের চিঠি.—
এটা যেন হাতদেখা 'Made Easy' এত সহজে হাতদেখা শেখা যায় জানতাম না। ধন্যবাদ।

—হরিহর রায়

এমিলজোলার

স্বপনচারিণী—২৸৹

অপনাকে এক অপরূপ রসলোকে অনুপ্রবিষ্ট করবার উপযোগী সাতটি সুমধুর প্রেমের গল্প।

ব্যারনার দ'্যাদে স'্যাপীয়ারের

পল ও ভির্জিনি—৩৲

(Paul et Virgenie-র বঙ্গানুবাদ)

রবীন্দ্রনাথকেও যা অভিভূত করেছিল :-
"···বিলাতী পৌলবর্জীনী (পল ও ভির্জিনি) পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা, সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্রসমীর-কম্পিত নারিকেল বন! ছাগল-চরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা সহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কী মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত! আর সেই মাথায় রঙীন রুমালপরা বর্জনীর (ভির্জিনির) সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙ্গালী বালকের কি প্রেমই জন্মিয়াছিল!"

মোপাস'ার

একাদশ—৩৷৹

(শ্রেষ্ঠ গল্পাবলীর সংকলন)

আপনি মাতৃভাষায় যে মোপাস'া পড়েছেন তা বোধহয় ইংরেজীতে চোলাই হয়ে এসেছে। এইগুলি কিন্তু মূল ফরাসী থেকে অনূদিত—অর্থাৎ কিছুই আমরা হারাই নি।

ছাপা হচ্ছে

'বিবাহিত প্রেম'—মারী ষ্টোপস্

বিশ্ববিশ্রুত 'Married Love'-এর বঙ্গানুবাদ। বিবাহ দু'টি হৃদয়কে মিলিয়ে দেয় কিন্তু সেই মিলটা কোথায় তাই খুঁজতে সারাজীবন কেটে যায়। এ বইয়ে তার সমাধান পাবেন।

'মনঃসমীক্ষণের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি'—ফ্রয়েড

জগদ্বিখ্যাত ফ্রয়েড-এর The Origin and the Developement of Psychoanalysis-এর অনুবাদ।

ক্রিকেট খেলার অ, আ, ক, খ

ডন ব্র্যাডম্যান

(সর্বকালের এবং সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটিয়ার Donald George Bradman-এর 'How to Play Cricket-এর অনুবাদ)

নৌকোয় তিন বন্ধু

(১১৫টি সংস্করণ ধন্য Jerome-এর 'we three in a boat'-এর বঙ্গানুবাদ)

অ্যাণ্টন চেখভ

চুম্বন

দ্বৈতযুদ্ধ

ব্যালজাক

সোনালী মেয়েটি

আর্ট এণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স। জবাকুসুম হাউস। ৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। কলিকাতা—১২

একটি

আরামদায়ক

উপহার...

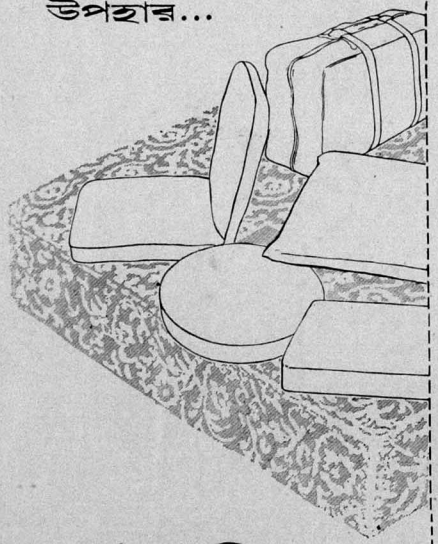

ডানলপিলো

রবারের ফেনা জমিয়ে তৈরি—

সর্বপ্রথম ও সর্বোৎকৃষ্ট

গড়ে মানুষের আয়ু ষাট বছর ধরলে, হিসেব করে দেখা যাবে তার জীবনের প্রায় আঠারো বছরই কাটে ঘুমিয়ে; চোদ্দ বছর কাজকর্মে, পাঁচ বছর ভ্রমণে, চার বছর পড়াশোনায়, পাঁচবছর খাওয়াদাওয়ায়, আর বছর তিনেক হয়তো কাটে রোগশয্যায়। বাকি সময়টা অবসর বিনোদন, আড্ডা ইত্যাদি। জুতার ফিতে বাঁধতেই মাস ছয়েক কেটে যায়। ডানলপিলোতে শুয়ে বসে এসব কিছুই আরো অনেক আরামে করা চলে—এজন্য ডানলপিলো সকলেই পছন্দ করবে। উপহার হিসেবে ডানলপিলো একটি চমৎকার জিনিস।

ওয়াড় সমেত বালিশ

পিঠে দেবার গদি

মোটর গাড়ির ফোল্ডিং গদি

চেয়ারের গদি

তোষক ও বালিশ সমেত ট্রাভেলিং কিট্

OPC-84 BEN

তুলি ও রংয়ের শ্রেষ্ঠ বিপনি

জি, সি, লাহা প্রাইভেট লিমিটেড্

১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা ১৩

ফোন—২৩-৩৮৩৮ ঃ গ্রাম—জিসিল

শারদীয় সম্ভাষণ

টাটা ষ্টীল

দেশের সেবায় নিরত

বৃষ্টি ভেজা গ্রাম। কানায় কানায় ভরা নদ নদী

খাল বিল। ঘরে ঘরে বৌ-ঝিরা সুরু করে ভাইফোঁটা ব্রত

দাওয়ায় আর উঠানে আলপনা আঁকে

সাত সওয়ারীর না'—আপনজন সব বিদেশ

থেকে ফিরবে—নাও তাদের নির্বিঘ্নে ঘাটে এসে ভিড়ুক.....

নির্বিঘ্ন যাত্রায় পূজার আনন্দ নিবিড় হোক

পূর্ব রেলওয়ে ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

মৌলিকতায়, নির্ভরতায় ও আধুনিকতায়
গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিস্ট
এম, বি, সরকার
এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলি-১২
ফোন ৩৪-১৭৬১ • গ্রাম: ব্রিলিয়ান্টস
ব্রাঞ্চ: বালিগঞ্জ - ২০০/২/সি - রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৯ • ফোন: ৪৬-৪৪৬৬
ব্রাঞ্চ - জামশেদপুর
ফোন: জামশেদপুর - ৮৫৮
শো রুমের পুরাতন ঠিকানা ১২৪, ১২৪/১ বহুবাজার স্ট্রীট · কলিকাতা - ১২ কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে

আলো
দীপ্তি লণ্ঠন কখনও খারাপ হয় না আর এর ব্যবহারে ২০ ভাগ কেরোসীন খরচ কম হয়। এই লণ্ঠন গঠনে মজবুত আর দেখতে সুন্দর।
আরো আলো
ভারতের জীবন স্পন্দিত হয় তার গ্রামে। দুশো বছরেরও বেশী এই গ্রামগুলি অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে ছিল। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আজ এই অন্ধকার ক্রমশঃ বিদূরিত হচ্ছে। এই উৎসবমুখর দিনগুলিতে 'দীপ্তি' শুধু আপনার গৃহই আলোকিত করবে না আপনার মনেও এনে দেবে নূতন আলো।
দীপ্তি
লক্ষ লক্ষ গৃহ আলোকিত করে
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রীজ
প্রাইভেট লিঃ
হেড অফিস: ৭৭, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফ্যাক্টরী: আগড়পাড়া এস্টেট

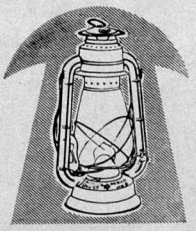

CAPSTAN ARE BEST

Stand out

FROM ALL THE REST

More *Satisfying*
More *Enjoyable*

CAPSTAN

they're blended better

ক্যালকেমিকোর

ক্যান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

বিশুদ্ধ **অলিভ অয়েল** ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তৈল সংমিশ্রণে এবং ক্যান্থারাইডিস্ সহযোগে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত। স্নিগ্ধ সুমধুর গন্ধে সুরভিত। কেশবর্দ্ধনে সহায়ক ও মরামাস নিবারক।

৫ আউন্স সুদৃশ্য আধারে পাওয়া যায়।

• নানা রকম খোঁপার ছবি সহ
"কেশবতী" পুস্তিকা চিঠি লিখলে পাঠান হয়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা - ২৯

"মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে
বাজিল বুকে সুখের মত ব্যথা।
মেঘের মত গুচ্ছ কেশরাশি
শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে"

সকল সময়ে, সব ঋতুতে জবাকুসুম আপনার কেশ-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।

জবাকুসুম

কেশ তৈল—

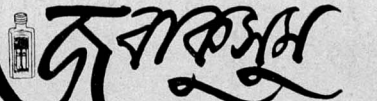

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

জবাকুসুম হাউস, ৩৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২
১১৭, আর্মেনিআন ষ্ট্রীট, মাদ্রাজ-১

CKJ.3BE,56

সকালের চা দিয়ে দিনটি সরস করে তুলুন

সমস্যা আপনার যা-ই থাক না কেন, সকাল থেকে মন-মেজাজ খারাপ করে সমস্ত দিনটাকে মাটি করে দেবেন না। এক পেয়ালা চা নিয়ে আরাম করে বসুন, আমি বলতে পারি পানের সঙ্গে সঙ্গে আপনার দেহ মনের অবসাদ কেটে যাবে, দৃষ্টি হবে সহজ ও স্বচ্ছ। আপনি তখন অনায়াসে যে-কোন সমস্যা সমাধানে সমর্থ হবেন।

আমার নাম চা—আমি সকালের সরসতার উৎস

TEA BOARD INDIA

PST 166

উৎসবের

সুরে-

সুর মিলিয়ে

সত্যিই চমৎকার!
ফিলিপসের কাছে পাবেন
নানান রকমের মডেল;—
সব ক'টিই গুণে সেরা
ডিজাইনে আধুনিক। বিশেষ
উপলক্ষ্যে সব ক'টিই
দেবার ম'তো পছন্দসই উপহার।

রেডিও
এসি, এসি-ডিসি অথবা ব্যাটারিযুক্ত মডেল। সর্বনিম্ন **মূল্য ১৭৫৲ টাকা।**

রেডিওগ্রাম
এসি, টেবিল এবং ফ্লোর মডেল
সর্বনিম্ন **মূল্য ৫২৫৲ টাকা।**

ডিস্ক-জকি
এসি। **মূল্য ১৮৫৲ টাকা**

ফিলিগ্রাম
ইলেকট্রিক গ্রামোফোন। এসি
মূল্য ৫৯৫৲ টাকা

রেকর্ড চেঞ্জার
এসি "তিন স্পীড" সম্পূর্ণ অটোমেটিক
মূল্য ১৯৫৲ টাকা

বড় সাইজের রেকর্ড
আধুনিক ও উচ্চাঙ্গ

"ডিপোল" এরিয়েল
আধুনিক এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল
এরিয়েল **মূল্য ৪৫৲ টাকা।**

স্থানীয় সেলসট্যাক্স ছাড়া সব ক'টি জিনিস একদরে বিক্রী হয়

একসঙ্গে বেচা এবং সারানোর দায়িত্ব গ্রহণই ফিলিপসের বৈশিষ্ট্য। মনে রাখবেন "বেচতে সারাতে 'ফিলিপস' আপনার রেডিও, রেকর্ড চেঞ্জার প্রভৃতি সারানোর প্রয়োজন হলে . . .

. . . ফিলিপসের অনুমোদিত বিক্রেতার হাতে ছেড়ে দিন।

PHILIPS

ফিলিপস্

গৃহের পূর্ণ প্রমোদের প্রয়োজনে

লিপটনের

ইয়েলো লেবেল চা

কিনুন

LYC-13

ভারতের

নিত্যসঙ্গী

★

.....বার্ম্মা-শেল।

চুলে

নূতন

জীবন দেয়

কেয়ো-কার্পিন

যথার্থ ফলপ্রদ কেশ তৈল

প্রস্তুতকারক :

দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ

কেয়ো-কার্পিন বিভাগ

কলিকাতা-১৩, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ

IPB

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়
সুভো ঠাকুর
বর্বর যুগের পর
প্রেমেন্দ্র মিত্র
শশিকুমার হেশ
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
ছবি দেখতে শেখা
অশোক মিত্র
শিল্পীশহর কলকাতা
বিনয় ঘোষ
ডুভিন
আশু চট্টোপাধ্যায়
উদ্বাস্তুদের শিল্পকৃতি
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাতির দাঁতের কাজ
বিশ্বনাথ চৌধুরী
চলচ্চিত্রের শিল্পতত্ত্বের সন্ধানে
অসীম সোম
রবীন রায়ের শিল্পবৈচিত্র্য
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ লিখন : সত্যজিৎ রায়
অঙ্গসজ্জা : রঘুনাথ গোস্বামী
রঙীন ব্লকপ্রস্তুত : ব্লকম্যান প্রসেস

নিয়মাবলী

লেখা ও লেখক সম্পর্কে। লেখক নয়, লেখাই আমাদের একমাত্র বিচার্য। খ্যাত অখ্যাত তরুণ প্রবীণ নির্বিশেষে সকলের লেখাই প্রকাশে আমরা আগ্রহশীল। শিল্পী এবং শিল্প সম্পর্কে প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প আমরা গ্রহণ করি।

শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কিত সচিত্র খবরাখবর পাঠাবার জন্যে আমরা সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

অনুলিপি রেখে লেখা পাঠাবার অনুরোধ করা হচ্ছে। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না।

এজেন্টদের সম্পর্কে। এজেন্টদের কমিশন শতকরা পঁচিশ টাকা দেওয়া হয়। দশ কপির কম এজেন্সি দেওয়া হয় না। সোল-এজেন্সির জন্যে কমপক্ষে পঞ্চাশ কপি নিতে হবে। অগ্রিম মূল্য ছাড়া পত্রিকা পাঠানো সম্ভব নয়।

গ্রাহকদের সম্পর্কে। প্রত্যেক কপি পোষ্টাল সার্টিফিকেটে পাঠানো হয়। সুতরাং কপি না পেলে পোষ্ট অফিসে খোঁজ নেওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের পক্ষে পুনরায় কপি পাঠানো অসম্ভব।

পত্রিকা সম্পর্কে। বিনামূল্যে নমুনা খণ্ড দেওয়া হয় না। সাধারণ সংখ্যার জন্যে সডাক এক টাকা চার আনা এবং বিশেষ সংখ্যার জন্যে সডাক আড়াই টাকা পাঠাতে হয়। রেজিষ্টিখরচ স্বতন্ত্র এক টাকা পাঠাতে হয়। বছরে দুটি যুগ্ম সংখ্যা—ভাদ্র-আশ্বিন এবং পৌষ-মাঘ—বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়। এই বিশেষ-সংখ্যা দুটির প্রত্যেকটির দাম দুটাকা। ভি, পি-তে পত্রিকা পাঠানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

সুভো ঠাকুর কর্তৃক ৫৪, গণেশচন্দ্র অ্যাভিন্যু থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। লালচাঁদ রায় কর্তৃক সেন এণ্ড কোং (প্রিণ্টার্স) প্রাইভেট লিমিটেড, ৭।১ গ্রাণ্ট লেন, কলিকাতা—১২ থেকে মুদ্রিত।

সুন্দরম্ | দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা | প্রথম বর্ষ | ভাদ্র ও আশ্বিন | তেরশো তেষট্টি

শিল্প কি ?
পুরাতনী
লোকশিল্প প্রসঙ্গে
বিনয়েন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
বাংলার নাট্যশালার দর্শক
অমল মিত্র
কথাকলি ও গোপীনাথ সম্প্রদায়
শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়
অবনীন্দ্র জন্মদিনে
দেবনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রচারশিল্পী ও, সি,
রঘুনাথ গোস্বামী
ভারতের কাঠখোদাই শিল্প
জি, ভেঙ্কটাচলম্
রাগরাগিণীর চাক্ষুষ চিত্র
অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
পূজানংখ্যার পর (গ্রন্থজগৎ)
নীলকণ্ঠ
নক্সা শিল্পী শ্রীমতী উমা দাস
নিজস্ব প্রতিনিধি
খবরাখবর

সুভো ঠাকুর অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্রটির নাম 'পূজার মিছিল'—পূজার আনন্দের মধ্যে নিরানন্দ উদ্বাস্তুদের আর্ত শোভাযাত্রা।

এই সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন

প্রেমেন্দ্র মিত্র রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। কবি। ছোটগল্প লেখক। ঔপন্যাসিক। চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালক। বর্তমানে কলকাতা বেতারকেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রবীণতম ও স্বনামধন্য সাংবাদিক। সাহিত্যিক। উনবিংশ শতকের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। লণ্ডনের ইন্‌স্টিট্যুট অব জার্নালিষ্টের সভ্য। দৈনিক বসুমতীর ভূতপূর্ব সম্পাদক।

অশোক মিত্র ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য। লোকশিল্প ও কলা সম্বন্ধে সারগর্ভ নানা প্রবন্ধাদির রচয়িতা। চিত্রকলা সম্পর্কে এঁর বাংলায় রচিত গ্রন্থাবলী উল্লেখযোগ্য। বাংলার জনসংখ্যার বিবরণীতে (সেন্সাস রিপোর্ট) হস্তশিল্পের এবং তার কারিগরদের সম্পর্কে এঁর লিখিত বিভাগটি মূল্যবান। বর্তমানে ইনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিবের পদে অধিষ্ঠিত।

বিনয় ঘোষ 'কলকাতার কালচার', 'কালপেঁচার নক্সা', 'জনসভার সাহিত্য' ইত্যাদির গ্রন্থকার। বাংলার ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবিষয়ক লেখক হিসাবে সর্বজনবিদিত। অধুনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বক্তৃতায় ব্যাপৃত।

আশু চট্টোপাধ্যায় অধুনালুপ্ত 'অগ্রগতি' সাপ্তাহিকের সম্পাদক। গ্রন্থকার। বহু উপন্যাস, গল্প ইত্যাদির লেখক। 'আনন্দবাজার', 'দেশ', 'মাসিক বসুমতী' ইত্যাদি পত্রিকায় লেখেন।

বিশ্বনাথ চৌধুরী অধুনালুপ্ত 'অগ্রগতি' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। কিছুদিন নিজেও একটি সাহিত্য পত্রের সম্পাদনা করেন। বাংলার লোকশিল্পের পরিসংখ্যান ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য অধিকারের সহিত যুক্ত।

অসীম সোম তরুণ সাহিত্যিক। বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে থাকেন। চলচ্চিত্রকলা সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী এবং সে-সম্পর্কে লিখিত রচনায় চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত তরুণ কবি ও প্রাবন্ধিক। সম্প্রতি প্রকাশিত প্রথম বাংলা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সংগ্রহ-গ্রন্থ 'হালকা মেঘের মেলা'-র সম্পাদক।

অমল মিত্র সুলেখক। কলকাতার পুরাকালীন নাট্যশালা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। 'স্টেটস্‌ম্যান', 'অমৃত-বাজার', 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' ইত্যাদি পত্রিকায় সচরাচর লেখেন।

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় নৃত্য, সংগীত, চিত্র প্রভৃতিতে বিশেষ অনুরাগী। এ-সমস্ত বিষয় সম্পর্কিত পুস্তিকাদির রচয়িতা। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'চলোমি'র কর্মসচিব। 'নববর্ষ' সাহিত্যবার্ষিকীর সম্পাদক।

রঘুনাথ গোস্বামী দক্ষ চিত্রশিল্পী হিসেবে অল্প বয়সেই সুনাম অর্জন করেছেন। দিল্লীর গত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে তাঁর কাজ নানা বিভাগে অনেকগুলি পুরস্কার পায়। সুলেখক। বর্তমানে জে. ওয়াল্টার টম্‌সন নামক প্রচার প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রচার-শিল্পী হিসেবে যুক্ত।

জি, ভেঙ্কটাচলম দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক। চিত্রকলা, নৃত্য, গীত প্রভৃতি বিষয়ে ইংরেজীতে লেখা বহু গ্রন্থের রচয়িতা। নিখিল ভারত হস্তশিল্প-সংস্থার এবং অন্যান্য বহু সরকারী ও বেসরকারী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত।

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ভারতবিখ্যাত শিল্প-সমালোচক। চিত্র, সংগীত, নৃত্য ইত্যাদি সম্পর্কে বহু গ্রন্থের লেখক। অধুনালুপ্ত প্রসিদ্ধ 'রূপম্' পত্রিকার সম্পাদক। ভারতীয় শিল্পকলার নবজাগরণে এঁর দান অনস্বীকার্য।

বিনয়েন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তরুণ শিল্পরসিক। কলা-প্রদর্শনীর উৎসাহী উদ্যোক্তা। সংগঠন-ক্ষমতা-বিশিষ্ট। লোকশিল্প সম্পর্কে বহু তথ্যের সংগ্রাহক।

দেবনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন সাম্প্রতিক চিত্রকরদের অন্যতম। অধুনা গুজরাটের একটি টেক্সটাইল মিলের অন্যতম নক্সাশিল্পী।

নীলকণ্ঠ তরুণ প্রবন্ধকারদের মধ্যে বিশেষ অগ্রণী। গল্প কবিতাও লেখেন। 'চিত্র ও বিচিত্র', 'তারা তিনজন', 'বসন্ত কেবিন' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

সুন্দরম্। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা। প্রথম বর্ষ। ভাদ্র ও আশ্বিন। তেরশ তেষট্টি।

সম্পাদকীয়

সুভো ঠাকুর সেদিন দৈনিক আনন্দবাজারখানা খুলে আনন্দের সঙ্গে আবিষ্কার করলো দেশের অন্যতম বিশিষ্ট রাজনৈতিক দল কংগ্রেস কর্তৃক শিল্পাচার্য নন্দলালের অভি-নন্দন। প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সাথে স্বনামধন্য শিল্পী শ্রীঅতুল বসুও শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন এই উপলক্ষ্যে। কংগ্রেসের মাহাত্ম্যে কো-এক্‌জিস্‌টেন্সের এ একটি নিশ্চিত নিদর্শন। শোনা যায়, কিছুদিন পূর্বে এই কংগ্রেস কর্তৃক সর্বজন-শ্রদ্ধেয় শিল্পী যামিনী রায়কে এবং সর্বজনস্বীকৃত প্রবীণ শিল্প-সমালোচক অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়কেও অনুরূপ অভিনন্দন জানানো হয়েছিল।

রাজনৈতিক দলাদলির ও সর্বপ্রকার রাহাজানির বাইরে থাকলেও মনে মনে কংগ্রেসকে এইরূপ প্রচেষ্টার দরুণ ভূরি ভূরি সাধুবাদ না করে পারল না সুভো ঠাকুর।

আচার্য নন্দলাল আজীবন বহু পরিশ্রম ও তাঁর নিখাদ সুবর্ণসম শিল্প-সাধনার দ্বারা যে সুনাম দেশের ও দশের জন্য অর্জন করেছেন তা রাজনৈতিক দলবিশেষ অথবা সরকারী সম্মানের কদাচ অপেক্ষা রাখে না। এঁদের মতো মহৎ শিল্পীর পক্ষে এইরূপ সম্মান নেহাতই অকিঞ্চিৎ-কর। তথাপি গুণীর আদর অবলোকন করলে কার না আনন্দ হয়? সুভো ঠাকুরের এইরূপ আর একবার আনন্দের অভিজ্ঞতা ঘটেছিল যখন সে শুনেছিল শ্রদ্ধেয় শিল্পী নন্দলাল ও যামিনী রায়কে 'পদ্মবিভূষণ'

বাটোয়ারা করা হয় আমাদের স্বাধীন ভারতের তরফ থেকে। দেশের বরেণ্য শিল্পীরা দেশের কাছ থেকে এতদিন বাদে তাহলে সত্যি সত্যি সম্মান পাচ্ছেন বটে!

তবে সুভো ঠাকুর সেই শুভ দিনের আশায় অপেক্ষা করে—যেদিন রাজনীতির 'সঙ্গে দেশের কলা-কৃষ্টি-সংস্কৃতির লোক-দেখান লৌকিকতার নয়, লোকচক্ষুর অন্তরালেও আসল আন্তরিক মালাবদল সম্ভব হবে। অর্থাৎ সেদিন তাঁরা একজন দুজন সর্বজনস্বীকৃত শিল্পী ও সাহিত্যিককে আড়ম্বরপূর্ণ অভিনন্দন দিয়েই শুধু ক্ষান্ত হবেন না, সমগ্র শিল্পিগোষ্ঠীকে উন্নততর সম্মান দানের এবং তাঁদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান সম্পর্কে সত্যিকারের সুচিন্তিত একটি পদ্ধতি প্রণয়নের প্রচেষ্টা করবেন।

বিশ্ববিখ্যাত বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠিতযশা প্রবীণ শিল্পীদের কংগ্রেস কর্তৃক এই সম্মান দানে আমরা সমবেতভাবে নিঃসন্দেহে সবাই সম্মানিত ও আনন্দিত, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষায় রইলাম কবে নিঃস্ব ভারতীর অজানা নিষ্ঠাবান নবীন শিল্পীর সার্থক সৃষ্টিকে ঐ একইরূপ স্বাগতম জানিয়ে অভ্যর্থনা করতে সক্ষম হবেন, সাহসী হবেন—সেই শুভ দিনটির জন্যে। নচেৎ এই সম্মান এই অভিনন্দন এই উপঢৌকন কাজ হাসিলের অছিলায় রাজনৈতিক দলের চাতুর্যপূর্ণ দাক্ষিণ্য হিসাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য। স্বাধিকারে সচেতন আধুনিক শিল্পীদের একথা সহজেই অনুমেয় হবে যে এই কৃপাকটাক্ষ আবহাওয়া নির্দেশকারী ঘড়ির কাঁটায় অর্থাৎ ব্যারোমিটারে প্রকম্পিত ইলেকশ্যানের আবহাওয়ার পূর্ব-ইঙ্গিত মাত্র।

এর পর, এই কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের শান্তিনিকেতনে এই অভিনন্দন জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে আগমন উপলক্ষ্যে আগত আনন্দবাজারের ষ্টাফ রিপোর্টারের সঙ্গে শ্রদ্ধেয় শিল্পী নন্দলালের যে কথোপকথন আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়েছিল তা আধুনিক শিল্পীদের জ্ঞাতার্থে সুভো ঠাকুর হুবহু উদ্ধৃত করলো। এই নিবন্ধটির যে-সব অংশে আধুনিক শিল্প ও শিল্পীদের সম্পর্কে অথবা তাদের পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় সুপ্রাচীন শিল্পীর মতামত সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত তা ইদানীংকালের প্রত্যেক শিল্পীর বিশেষভাবে মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করা কর্তব্য বিবেচনায় এরূপ উদ্ধৃত করা হলো।

মডার্ন আর্টিষ্ট সম্বন্ধে আচার্য নন্দলাল

শান্তিনিকেতন, ২২শে আগষ্ট— "আসলে আজকাল যে সব মডার্ন আর্টিষ্টরা মডার্ন ছবি আঁকছেন তাঁরা আর্টিষ্টই নন, তাঁরা সত্যিকার ছবি আঁকতেই পারেন না। সেই অক্ষমতা ঢাকার জন্যে, সস্তায় বাহবা পাবার জন্যে, বিলিতি ছবি 'কপি' করে করে চলেছেন। কিন্তু ছবি আঁকতে গেলে খাটতে হয়। অবনীবাবু খেটেছেন, আমরাও খেটেছি অনেক।"

...ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন তিনি—

"দেখো, আজকাল সকলেই ভাবছে ছবিতে নতুন কিছু করি, ওটা একটা ফ্যাসানের মত। আমাদের দেশের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায় না, তবু বিদেশী জিনিষ আমদানী করা চাই। কিন্তু জোর করে তো পরিবেশ তৈরী করা যায় না। বিদেশী ছবি ওদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়েছে তাই ওদের ছবিও ভাল হয়েছে। বিদেশী জিনিষ নিতেই পারবে না, এমন কথা বলিনে, তবে ওদেরটা 'এ্যাসিমিলেট' করতে হবে, আর আমাদের পুরাতন ধারায় এগিয়ে যাওয়া চাই। এই ধারা অবনীবাবু ও আমি নিয়েছি, পুরাতন থেকে অনেক কিছু পেয়েছি। শুধু কি 'ইণ্ডিয়ান'? 'চাইনিজ', 'জাপানীজ' থেকেও নিয়েছি। ওদের সঙ্গে আমাদের ধারার মিল রয়েছে যে। বিলিতি ছবি 'থ্রি ডাইমেনশন্যাল', আর আমাদের প্রাচ্য ছবি 'টু ডাইমেনশন্যাল'। ওদেরটা আমাদের সঙ্গে খাপ খায় না।"

আজকালকার ছবির বর্ণবাহুল্য আপত্তিজনক কিনা জিগ্‌গেস করাতে বললেন—

"রঙ বেশী দিলেই ছবি খারাপ হয় না, তবে ঠিকমত রঙ লাগাবার ক্ষমতা থাকা চাই। আমাদের দেশী ছবি বা রাজপুত ছবিতেও বর্ণবাহুল্য আছে। কিন্তু বর্ণবাহুল্য করবো বলে জোর করে রঙ চাপালে জৌলুস বাড়ে, ছবি হয় না।"

আলোচনা প্রসঙ্গে সোভিয়েট ছবির কথা তুললুম। একটু হেসে বললেন—

"সোভিয়েট আর্টিষ্টদের আর্টিষ্ট বলি কি করে? ওরা 'প্রোপাগাণ্ডিষ্ট'। 'প্রোপাগাণ্ডা' 'আর্ট' নয়। ওরা তো কেবল 'লীডারদের' ছবি এঁকে এঁকেই গেল। ওদের আগেকার আর্ট তবু ভাল। তার সঙ্গে রেনেশাঁর যোগ ছিল।"

আজকালকার ছবিতে এক্সপেরিমেণ্ট চালানো

সম্বন্ধে তিনি বললেন,—"হাঁ, এক্সপেরিমেণ্ট ভাল তবে আমি কিছুই জানি না, অথচ এক্সপেরিমেণ্ট করছি সেটা হয় না। 'মাতিসে', 'এপষ্টাইন', বড় আর্টিষ্ট। ডুয়িং ভাল জানতেন। তাঁরা অনেক এক্স-পেরিমেণ্ট করেছেন। তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না।"

...শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে বললেন—

"এখানে আমরা নজর দিই প্রথমে তিনটে জিনিষের উপর—'অরিজিন্যালিটি', 'নেচার ষ্টাডি' এবং 'ট্র্যাডিশন'। প্রথমে 'নেচার' থেকে ছবি নেবে, কিন্তু সেটা অরিজিন্যাল হওয়া চাই। তারপর আসে ঐতিহ্যের কথা। 'ট্র্যাডিশন্যাল' হলেই 'ষ্টিরিওটাইপড' হয় না। তার প্রমাণ অবনীবাবুর ছবি, রবীন্দ্রনাথের কবিতা। অবনী-বাবু অনেক পুরানো 'সাবজেক্ট' নিয়ে ছবি এঁকেছেন, রবীন্দ্রনাথ মহাভারত, রামায়ণ থেকে কত কাহিনী নিয়ে কবিতা লিখেছেন। সেও তো নূতন সৃষ্টি হয়েছে। 'অরিজিন্যালিটি' থাকলে 'সাবজেক্ট' একঘেঁয়ে হয় না। আমি বীরভূমের দৃশ্যাবলীর একই ছবি এঁকেছি অনেক, তবু সে একঘেয়ে হয়নি 'ইমাজিনেশনের' জন্যে। ধরো 'বসন্ত ঋতু'। এই ঋতু নিয়ে কালিদাস থেকে আরম্ভ করে কত কবিই না কবিতা লিখেছেন, সে কি একঘেয়ে হয়েছে? হয়নি। কারণ, প্রত্যেক কবিরই 'অরিজিন্যালিটি' ছিল। ছবিও একঘেয়ে হয় না, —'অরিজিন্যালিটি' থাকলে, 'ইমাজিনেশন' থাকলে। আজকালকার মডার্ন আর্টিষ্টরা নূতনত্বের মোহে 'নভেলটি' দেখাচ্ছেন কিন্তু 'অরিজিন্যালিটি' দেখাতে পাচ্ছেন না?"

"আমার ধারণা কি জান? মডার্ন আর্টিষ্টরা 'নেচার'কে বড় ভয় পান। কিন্তু 'নেচার'কে বাদ দিয়ে ছবি কি করে হবে। আজকালকার আর্টিষ্টরা যদি চিরকাল কলকাতাতেই কাটান তবে ছবি হবে না। কেবল বড় বড় চৌকো চৌকো, লম্বা লম্বা বাড়ী দেখে 'কিউবিজম' করতে হবে। তবে হাঁ, গুরুদেবের গানও যদি একটু মন দিয়ে শোনেন তবে কাজ হয়। গুরুদেব গানে 'নেচার'কে বেঁধে রেখেছেন, কথায় সুরে। ওঁর গানগুলো শুনলেই 'নেচার'কে বোঝা যায়।"

...প্রণাম করে বাইরে বেরোতে যাচ্ছি। যাবার পথে বললেন—"তবে দেশের শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ভেবো না। এই যে এতগুলো প্রবহমান ধারা চলেছে তার সঙ্গে চলে চলে নতুন ধারা আসবে। তবে হাঁ, সময় লাগবে। অবনীবাবু সেই ধারায় করলেন, আমি করলুম, তারপর আমার পর অন্য কেউ করবে। ধারা অব্যাহত থাকবে।"

এবার সুভো ঠাকুরের মনে আনন্দবাজারের ষ্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত এই লেখাটি পর্যালোচনের পর একটি জিজ্ঞাসা বারম্বার জাগরূক হয়েছিল যা সর্বসাধারণের নিকট বিনীতভাবে সে নিবেদন করতে বাধ্য হচ্ছে—তা, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ছবি এবং সেই সঙ্গে আচার্যের সাক্ষাত শিষ্য এবং তাঁরই আওতায় বর্ধিত দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ সম্পর্কে আচার্য নন্দলালের অভিমত কী? এ বিষয়ে জানতে পারলে 'আধুনিক' বিশ্লেষণহনকারী অনেকেরই সন্দেহ এবং জিজ্ঞাসার সমাধান এবং অবসান ঘটবে আশা করা যায়।

সুভো ঠাকুর বলে—বলতে গেলে সে একপ্রকার বাল্যকালেই আর কি—একদা সুরেশ সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্যের' একটি বাঁধানো খণ্ড তার হাতে এসে পড়ে—তাতে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ও তৎশিষ্য গোষ্ঠীসম্পর্কে প্রকাশিত সমালোচনায় আচার্য নন্দলালের আধুনিকদের সম্পর্কে উক্তির অনেকাংশে অদ্ভুত মিল মনে হতে পারে। তখন হয়তো অবনীন্দ্রনাথ নবীন ছিলেন এবং তৎশিষ্য নন্দলাল প্রমুখেরাও নবীনতর ছিলেন। নবীনের বিরুদ্ধে প্রবীণের এই বিক্ষোভ অথবা অভিযোগ সুভো ঠাকুরের মনে হয় খুবই স্বাভাবিক। হয়তো প্রাচীনত্বের এটা অপর এক দিক। অদূর ভবিষ্যতে সে মোটেই আশ্চর্য হবে না যেদিন সে দেখবে এই স্বভাবের পরিবেশে হয়তো একে একে আজকের দিনের উগ্র আধুনিকেরাও তাঁদের পরবর্তী আধুনিকদের উদ্দেশে দ্বিতীয় অদুলি উত্তোলনপূর্বক ঐরূপই উপদেশ দিতে আকুল।

সৃষ্টির রাজত্বে প্রাচীনের এই সতর্কবাণী যেমন স্বাভাবিক, তেমনি নবীনেরও সকল বাধা সকল উপদেশ উপেক্ষা করে, চিরনবীন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—পুচ্ছদেশ উচ্চে তুলে নাচিয়ে চলার অহমিকাও ঐ একইরূপ স্বাভাবিক। অন্তত সুভো ঠাকুর তো তাই মনে করে।

তুলি না থাকলে হাত দিয়ে আঁকবো, হাত না থাকলে কনুই দিয়ে আঁকবো...আর কিছু না থাকলে, মন দিয়ে আঁকবো

—অবনীন্দ্রনাথ

॥ কালিঘাটের পটুয়াদের আঁকা একটি ছবি ॥

বর্বর যুগের পর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অনেকদিন আগের কথা।

কালিঘাটের একটি রাস্তায় যেতে যেতে একটি ছোট ছেলে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত।

কালিঘাটের সে রাস্তা লম্বায় চওড়ায় তেমনি আছে, শুধু তার চেহারা গেছে বদলে।

হয়ত ছোট ছেলেরা এখনো আপন খেয়ালে ঘুরতে ঘুরতে আজও সেখানে কোথাও দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সেদিনের সেই ছোট ছেলেটি যা দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে চলৎশক্তিহীন হতো সে দৃশ্য আর সেখানে দেখা যায় না।

সেদিনের ছোট ছেলেটির সবিস্ময় কৌতূহলের বস্তু ছিল একটি বিশেষ ধরনের ছবি। রাস্তার ধারে সঙ্কীর্ণ ছোট দোকানের মাদুর পাতা মেঝেতে উবু হয়ে বসে তুলির কয়েকটি নির্ভুল টানে নিতান্ত নগণ্য চেহারার ময়লা জামাকাপড়-পরা পটুয়াকে মজার সব অদ্ভুত ছবি ফুটিয়ে তুলতে সে দেখেছে।

হাওয়া তখনই বদলাতে সুরু করেছে। যে দোকানে বসে পটুয়ারা তার এইসব ছবি আঁকে তারই দেওয়ালে বিদেশ থেকে ছেপে আসা জমকালো রঙের দেবদেবীর ছবি তখন খদ্দেরদের মনোহরণ করে নিয়েছে। পটুয়ার তুলিতে আঁকা ছবির আর কদর নেই। মন্দিরে তীর্থ করতে যারা আসে ঘর সাজাবার জন্য ওই বিদেশী রঙচঙে ছবিই তারা কিনে নিয়ে যায়। তবু পটুয়া যে তখনো তার তুলি রং ফেলে না দিয়ে দোকানদারীর অবসরে মেঝেয় কাগজ পেতে আঁকতে বসে সে বোধ হয় শুধু অভ্যাসের দোষে।

তারপর সে যুগও বদলে গেল। কালিঘাটের সে রাস্তায় ছবির দোকান এখনো আছে, কিন্তু সে একেবারে অন্য জাতের ছবি। দোকানের মেঝেতে তো নয়ই, সে পটুয়াকে কোথাও আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পরলোকগত বাংলার কোনো দরদী মনীষীর উৎসাহে পরিণত বয়সে তাদের খুঁজে বার করবার চেষ্টা একবার করেছিলাম। খুঁজতে যেতে হয়েছিল অনেক দূর।

খাস কলকাতা নগদ পয়সায় ফেঁপে উঠে যত বিস্তৃত হয়েছে, এই সব ভুলে-যাওয়া শিল্পীদের তত ঠেলে নিয়ে গিয়েছে অনাবশ্যক জঞ্জালের মত শহরের দূরতম সীমান্তে। সে পটুয়ারা তো নেই-ই, তাদের বংশধরেরাও জীবিকার প্রয়োজনে সে নিরর্থক পেশা ছেড়ে কেউ পাইকলে কেউ ওইরকম আর কোথাও এখন হাজিরা দেয়। রক্তের ডাক যারা একেবারে

অগ্রাহ্য করতে পারেনি তারা প্রতিমাগড়া কুমোরদের জন্যে সস্তা চালচিত্র আঁকে।

সেকেলে সে সব ছবির কথা জিজ্ঞাসা করায় তারা অনেকেই ঘাড় নেড়েছে। কোথায় পাবে সে সব ছবি? তাদের বাপ-দাদারা আঁকত বটে, তাদের সঙ্গেই সে আঁকার বিদ্যে গিয়েছে শেষ হয়ে।

ওরই মধ্যে দু'একজন অনেক পেড়াপেড়ীতে কিম্বা যথেষ্ট বকশিষ পাওয়ার আশ্বাসে, নিয়ে গেছে শহর সীমান্তের তাদের টিন কি খোলায় ছাওয়া কুঁড়েতে। তারপর চালের বাতায় গোঁজা পাকানো কাগজের বাণ্ডিল বার করে বেশ একটু কুণ্ঠিত ভাবেই মেলে ধরেছে। এ বস্তুর জন্যে কেউ উৎসুক হতে পারে এ বিশ্বাসটুকুও তাদের আর নেই। কাগজের বাণ্ডিলের অবস্থা অবশ্য শোচনীয়। কালের ধর্মে, ঝুলে ধোঁয়ায় সেগুলি বিবর্ণ শুধু নয়, খসে যাবার মত হয়েছে। শিল্পরসিক কীটেরাই তাকে রেহাই দেয়নি।

এই জীর্ণ বাণ্ডিলের ভেতর থেকেও যে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত অক্ষত ছবি বেরিয়েছে তা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায়নি। শুধু যে তার মধ্যে ওস্তাদের হাতের কাজ আছে তা নয়, হাত যাদের পাকেনি নকল করে কাজ চালিয়ে যাবার নক্সাও তাদের জন্য ছকে রাখা আছে।

যাঁর সঙ্গে এ ছবি সংগ্রহে গেছলাম তিনি আশাতীত মূল্য দিয়ে সব কিছুই নিয়েছেন এবং তারপর তাঁর ও আরো অনেক লুপ্তশিল্প-সন্ধানী রসিক সমঝদারের মারফৎ এই হারানো পটুয়াদের ছবি সম্বন্ধে মূল্যবান সব সন্দর্ভ অভিজাত বহু পত্রিকায় পড়বার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। বর্তমান কালের বিখ্যাত কোন কোন শিল্পীর ছবিতে সেই হারানো যুগের ধারা থেকে নতুন প্রবাহ সৃষ্টির দৃষ্টান্তও আমরা পাচ্ছি। বড় বড় চিত্র-প্রদর্শনী কি সমৃদ্ধ রসিকজনের বাড়িতে গেলে পরিচ্ছন্ন করে বাঁধান ও পরিপাটি করে সাজানো এ সব ছবি আমরা দেখতে পাই।

কিন্তু সেই সঙ্কীর্ণ দোকানঘরের ময়লা মাদুরে বসে আঁকবার পটুয়া আর নামমাত্র মূল্যে তা কেনবার সাধারণ গুণগ্রাহী খদ্দের আজ আর কোথাও নেই।

শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা দুনিয়ারই শিল্প-কলার জগতের পক্ষে এটি এমন একটি আপাত অকিঞ্চিৎকর ঘটনা যার তাৎপর্য তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে শিল্প সংস্কৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আত্মপ্রসাদ বেশ একটু চিড় খায়।

এতক্ষণ কালিঘাটের পট ও পটুয়াদের কথা যে বলছিলাম তা বলাই বাহুল্য। এ সব এখন রসিক সংগ্রাহকদের সাত রাজার ধন, সমঝদার সমালোচকদের হাতের পাঁচ। কিন্তু যাদের অনুগ্রহে উৎসাহে ও যাদের মুখ চেয়ে এ পট একদিন জন্ম নিয়েছিল তাদের কাছে এ পট আজ কাগজের দামেও আর বেচা যায় কি?

তা যে যায় না, এই লজ্জাকর সত্য অস্বীকার করে লাভ নেই। আর এ সত্যের আলোয় দেখলে এ যুগের সমস্ত সৌন্দর্য-চর্চার ভিত-ই বুঝি বেশ কিছুটা ধ্বসে পড়ে।

সেদিন কালিঘাটের পট যারা এঁকেছে, ক্ষমতা যত অসাধারণই হোক, তারা সমৃদ্ধ বিদগ্ধ সমাজের কেউ নয়। সে পট যারা কিনেছে তারাও নেহাৎ সাধারণ লোক। দামী মোটা কেতাব লিখে এ পটের কেরামতি ব্যাখ্যা করবার বিদ্যে না থাকলেও, তার রসগ্রহণের ক্ষমতা তাদের ছিল বলেই এ পটের তখন কদর হয়েছে।

দেখতে দেখতে তাদের সে রসবোধ শুকিয়ে গেল কি করে? গেল, হঠাৎ এক বর্বর সমাজের অভ্যুত্থানে নয় কি?

ইতিহাসে বর্বরদের আক্রমণে বহুদিনের সমৃদ্ধ শিল্প সংস্কৃতির বিলুপ্তির এমন দৃষ্টান্ত আমাদের অনেক জানা আছে। এখানে তফাৎ শুধু আক্রমণ নয় অভ্যুত্থানের।

এই দেশেই ঐতিহাসিক কয়েকটি দুর্ঘটনায় ও অর্থনৈতিক কয়েকটি নিয়মের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় বর্বর এক সমাজ বলতে গেলে এই সেদিন হঠাৎ জেগে উঠেছিল।

সে বর্বর সমাজ আর কেউ নয়, আমরা,—কোম্পানীর দৌলতে যাদের পয়সার প্রতিপত্তি শুরু। সেই তথাকথিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত কলমবাগীশ কেরানী ও জমির উপস্বত্বভোগী শ্রেণী।

এই শ্রেণীর উদ্ভবের আগে এ দেশে শিল্প সংস্কৃতির একটা অক্ষুণ্ণ অব্যাহত সার্বজনীন ধারা চলে আসছিল একথা যেমন মিথ্যা, তেমনি এই নব বর্বর সমাজের আবির্ভাবের পর আমাদের সমস্ত স্বাভাবিক শিল্প প্রেরণায় যে আকস্মিক ছেদ পড়েছিল একথাও সম্পূর্ণভাবে সত্য।

বিদেশী বণিকদের প্রয়োজনে ও নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রশ্রয়ে উদ্ভূত হয়ে এই নব পাশ্চাত্য-দেশের শিক্ষা-সন্ধানীরা এ দেশের ইতিহাসের ধারা বদলানোর ব্যাপারে অনেক বড় ভূমিকা নিয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কোন কোন দিকে এ দেশের নাড়ীর সঙ্গে যোগ যে কখন তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তা বোধ হয় টেরও পায়নি।

বিদেশী মনিবের মন-যোগানো ভাষা শিখতে গিয়ে সে মনিবের ওপরেও টেক্কা দিয়ে তার দেশের সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে যত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ পাতিয়েছে নিজের দেশ তার কাছে তত দূর হয়ে পড়েছে।

উনবিংশ শতাব্দী থেকে এই ব্যবধানের সূত্রপাত, বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তা প্রায় দুস্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দু'চারটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে সাধারণ ইংরাজী শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে কালিঘাটের পটের মত এ দেশের অনেক কিছুরই তখন কোন আবেদন নেই। সে যুগে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে যাঁদের জন্ম তাঁরা স্মরণ করে দেখতে পারেন তাঁদের শৈশব কৈশোরে নিজেদের পরিবারে কি ধরনের শিল্পবোধের পরিচয় তাঁরা পেয়েছেন।

কৃষ্ণনগরের পুতুলকে ছোটদের মজার খেলনা হিসাবে কিছুটা মূল্য দিলেও কালিঘাটের পট তখন দৃষ্টিপাতের অযোগ্য। কবির লড়াই কি ঝুমুর, যাত্রা কি কথকতা, এমন কি কীর্তনের পর্যন্ত, হয় অশিক্ষিত নয় ধর্মানুরাগীদের মহলের বাইরে বিশেষ কোন খাতির নেই। নেহাৎ ধর্মের অনুষ্ঠান আচারের সঙ্গে জড়িত থাকার দরুণ ডাকের সাজ কি প্রতিমা গড়ার মত কোন কোন শিল্পধারা সমঝদার পেলেও সম্মান পায় না। তথাকথিত শিক্ষিত সাধারণ তখনও কোঁচা দেওয়া ধুতির ওপর ব্রেষ্ট সার্ট গায়ে চড়িয়ে ফিতে-বাঁধা জুতো না পায়সু পরবে স্থির করতে পারেনি। ধনীদের বাড়ির বৈঠকখানায় বড় বড় বিলেতি ছবি আর ইটালীয়ান ভাস্কর্যের নকল সাজানো থাকে। বড় বড় মোকান তৈরী করার মুরদ যাদের আছে তারা গ্রীক রোম্যান কলোনিয়ালের খিচুড়ি বানিয়ে মোটা মোটা থাম দেওয়া প্রাসাদ তোলে। সে প্রাসাদের বাগানে অর্ধোলঙ্গ বিদেশী ভাস্কর্যের নারীমূর্তি শোভা পায়।

ব্যতিক্রম যে এর মধ্যে ছিল তা আগেই বলেছি। এই বর্বরতার প্লাবনের মধ্যে শিল্প সংস্কৃতির প্রাণবীজ কেউ কেউ সযত্নে সন্তর্পণে লালন করেছেন। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে প্লাবিত দেশের মধ্যে এইসব বিচ্ছিন্ন অপরিসর দ্বীপ অধিকাংশই ঠাকুর বাড়ির মত বনেদী সম্ভ্রান্ত পরিবারের—আধুনিক কালকে উপেক্ষা না করেও যাঁরা প্রাচীন প্রাণশিখাকে নির্বাপিত হতে দেননি। অনেক সময়ে তাঁদের অনেকে নিজেদের লুপ্তসত্তা পুনরাবিষ্কারও করেছেন এবং তার জন্যে ব্যঙ্গ কৌতুক উপহাসের পাত্রও তাঁদের কম হতে হয়নি।

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ভারতীয় তুলির টান বিদগ্ধ রসিক সমাজের অভিনন্দন পেলেও সাধারণের বিমূঢ় বিদ্রূপের খোরাক যে তখন জুগিয়েছে একথা লজ্জাকর হলেও লুকোবার নয়। পরম দুঃসাহসে প্রথম যে বাঙালী মহিলা দেশীয় নৃত্যকলার পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন, কি সকৌতুক বিদ্রূপের অভ্যর্থনা তাঁর এ প্রচেষ্টা সাধারণের মধ্যে পেয়েছিল তা হয়ত অনেকেরই এখনও স্মরণ আছে।

তারপর ইতিহাসের চিরন্তন সত্যই আবার প্রমাণিত হলো। বর্বরেরা গোড়ায় যা ধ্বংস করে শেষে তারই ধারক হয়ে দাঁড়ায়। এদেশেও তাই হয়েছে। সে-দিনের সেই নববর্বর সমাজই আজ নিজেদের শিল্পসত্তাকে নতুন করে খুঁজে পেয়ে তার সত্যকার সাধক হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে ইতিমধ্যে যন্ত্রযুগের কল্যাণে আমাদের জীবনের ভিত্তিই যাচ্ছে বদলে। জীবনের ধারার সঙ্গে জড়ানো যে শিল্পবোধ তাকে সার্থক করার উপায়ই এখন আমাদের আয়ত্তের বাইরে। শুধু এখানকার নয়, সারা দুনিয়ারই এই এক সমস্যা। শিল্প মাত্রেই এখন একটি স্বতন্ত্র বিচিছন্ন বস্তু, বিশেষ অবসর সংগ্রহ করে যা উপভোগ করতে হয়। সে বিশেষ অবসর আবার সকলের লভ্য নয়।

রম্য কলাচর্চায় উৎসাহের অভাব কি ত্রুটি আর আমাদের নেই, কিন্তু ছেঁড়া মাদুরে কি ময়লা পোষাকে না হোক, যে কোন বেশে যে কোন রূপে কালি-

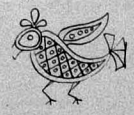

ঘাটের সে নামহীন পটুয়া মন্দির কি হাটের পথের ধারে তার রঙের বাটি নিয়ে আবার কোন-দিন এসে বসবে যদি ভাবতে পারতাম!

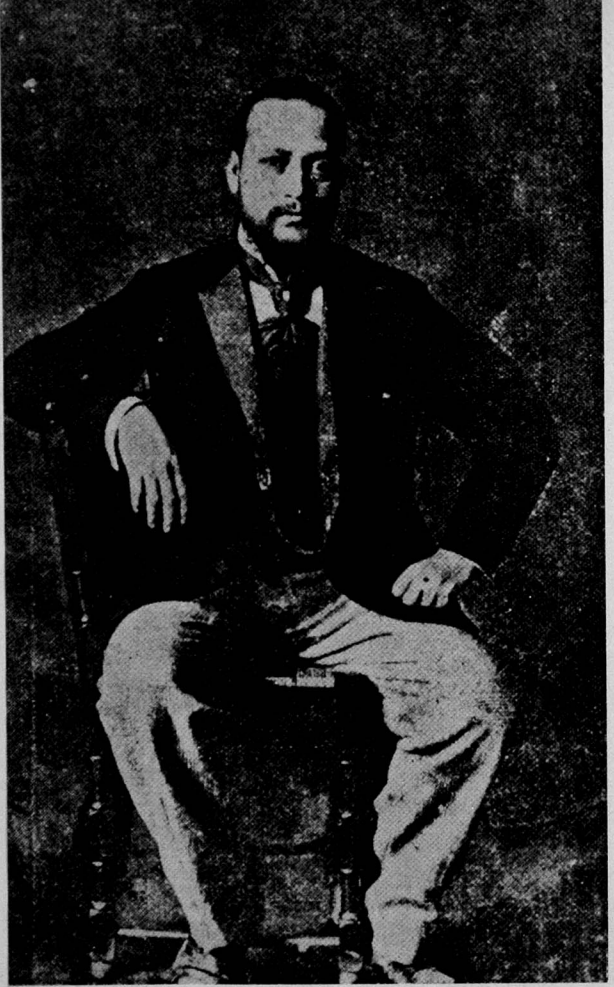

শশিকুমার হেশ

শশিকুমার হেশ

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধরশিখরে,
গগনের গৃহ তন্ন-তন্ন ক'রে,
বায়ু, উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার স্বদেশীয়দিগকে বাঙ্গালার প্রথম জাতীয়তার কবি হেমচন্দ্রের এই উপদেশ যে বাঙ্গালী জীবনের সকল ক্ষেত্রেই গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, নবভারতে নানা ক্ষেত্রে বাঙ্গালী অগ্রণী—পথ-প্রদর্শক। সেই জন্যই ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষ লিখিয়াছিলেন—

"What Bengal thinks tomorrow, India will be thinking tomorrow week."

যে প্রবন্ধে তিনি এই কথা লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি চিত্রবিদ্যায় ও ভাস্করকার্যে বর্ত্তমান ভারতে ভারতীয়দিগের শিল্পনৈপুণ্যের অভাবের এ রুচি-বিকারের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"Even in this alien sphere a Bengali has been winning noble renown and that too in Italy, the native land of painting, the land of Raphael, Da Vinchi and Angelo, and among Italians, with whom artistic taste is an instinct."

যে বাঙ্গালী চিত্রকরের সম্বন্ধে অরবিন্দ এই উক্তি করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম আজ বাঙ্গালী বিস্মৃত —তিনি শশিকুমার হেশ। তাঁহারও পূর্ব্বে এক বাঙ্গালী তরুণ চারুকলায় নৈপুণ্য অর্জ্জনের আগ্রহে য়ুরোপে গিয়াছিলেন। কিন্তু রোহিণীকান্ত নাগ সেই বিদেশে অর্থাভাবে—স্বল্পাহারে, কখন বা অনাহারে, দুশ্চিন্তায়, অনিদ্রায়, ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। সেই শোচনীয় ঘটনা স্মরণ করিয়া সেই সময় কোন বাঙ্গালী লেখক মন্তব্য করিয়াছিলেন —"রোহিণীর এই শোচনীয় অকালমৃত্যুর জন্য কে দায়ী—তাহার আত্মীয়বর্গ, না দেশের ধনিগণ, না সে নিজে? কাহার দোষে ভারত-মাতার এই শোক, তাহা ঠিক বলা সহজ নহে। বোধ হয়, সকলকে সমান ভাগ করিয়া দিলে কাহারও আপত্তি থাকিবে না।"

শশিকুমার হতভাগ্য রোহিণীর পরবর্ত্তী—পথ-প্রদর্শকের অনুসরণকারী। ময়মনসিংহ জিলার নেত্র-কোণা মহকুমার অন্তর্গত সাজিউড়া গ্রামে দরিদ্র পরিবারে শশিকুমারের জন্ম হইয়াছিল। পিতা তাঁহাকে শৈশবে একটি ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ে ছাত্র করিয়া দেন। তথা হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেও কোন কারণে তাঁহার ভাগ্যে বৃত্তি লাভ ঘটে নাই। এই বিদ্যালয়ে পাঠকালেই ইংরেজী ও পার্শী ভাষা শিখিবার জন্য শশিকুমার আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সুযোগের অভাবে বর্ণমালার অধিক শিক্ষা করা হইয়া উঠে নাই। চিত্রবিদ্যানুরাগ তাঁহার পক্ষে জন্মগত বা ধাতুগত ছিল এবং অশিক্ষিতপটুত্ব হেতু তিনি বাঙ্গালা, ইংরেজী, পার্শী ও দেবনাগরী অক্ষর ছাপার অক্ষরের মত লিখিতে পারিতেন, অথচ বাঙ্গালায় তাঁহার দ্রুত লিখিবার অভ্যাস ছিল।

অর্থাভাবে পাঠে আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া শশিকুমার যখন স্থানান্তরে যাইয়া গ্রামের কোন লোকের আশ্রয়ে থাকিয়া চাকরীর চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তথায় একটি ইনস্পেক্টিং পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়।

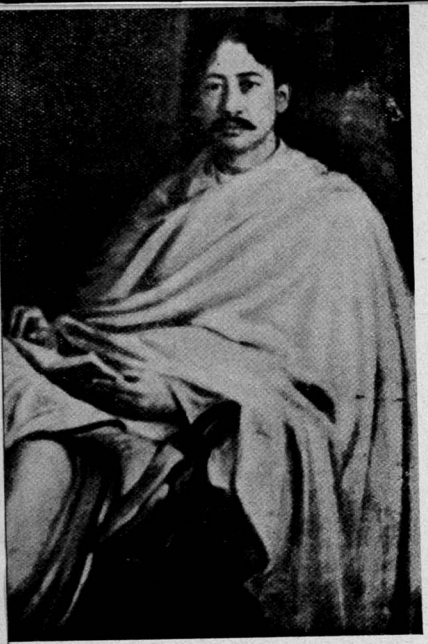

শশিকুমার হেশ অঙ্কিত সন্তোষের কবি প্রমথ রায়চৌধুরী।

তুলনায় তাঁহার অপেক্ষা যোগ্য প্রার্থী থাকিলেও কর্তৃপক্ষ আবেদনে তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর হস্তাক্ষর দেখিয়া ও তাঁহার নিঃসহায় অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহাকেই এই পদে নিযুক্ত করেন। তখন শশিকুমারের বয়স অল্প।

সেই সময়েই তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিরা তাঁহার শিল্পানুরাগ—বিশেষ চিত্রবিদ্যায় আনুরক্তি ও নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। তখন ইনস্পেক্টিং পণ্ডিতের মাসিক বেতন ১২৲ টাকা। কোন কাজই শশিকুমার অসাধ্য মনে করিতেন না। যদিও পূর্ব্বে কখন তাঁহার বন্দুক বা হার্ম্মোনিয়ম নাড়াচাড়া করিবার সুযোগ ঘটে নাই তথাপি এই সময়ে কাহারও বন্দুক বা হার্ম্মোনিয়ম বিকল হইলে তিনি সাগ্রহে তাহা সংস্কারে প্রবৃত্ত হইতেন ও সাফল্য লাভ করিতেন। একখানি উকা লইয়া ছাতার অব্যবহার্য লৌহদণ্ড হইতে তিনি উৎকৃষ্ট বড়শী প্রস্তুত করিয়া লোককে উপহার দিতেন।

তখন তিনি সৎসঙ্গ ভালবাসিতেন এবং ধর্ম্ম-পিপাসাহেতু প্রতি রবিবারে ১০-১২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া উপাসনায় যোগ দিতেন।

ছয় বৎসর তিনি ঐ পণ্ডিতের কার্যে অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি একখানি ফটোগ্রাফ পাইলে তাহা বৃহদাকারে অঙ্কিত করিতে পারিতেন। সে চিত্র ত্রুটিশূন্য না হইলেও অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক হইত।

ইহার পরে ময়মনসিংহ জিলা বোর্ডের একটি বৃত্তি সংগ্রহ করিয়া শশিকুমার চিত্রবিদ্যা শিক্ষার্থ কলিকাতায় আসিয়া আর্ট স্কুলে প্রবেশ করিয়া সোৎসাহে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। কোন কারণে বোর্ড তাঁহাকে বৃত্তিতে বঞ্চিত করেন এবং কলিকাতায় তিনি অর্থাভাবে বিপন্ন হইয়া পড়েন। কিন্তু অদম্য উৎসাহে তিনি একখানি খোলার ঘরে বাস করিয়া পরিচিতদিগের দয়াদত্ত ঋণে নির্ভর করিয়া আর্ট স্কুলে শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। তাঁহাকে সতীর্থদিগের নিকট হইতে ২-১ ঘণ্টার জন্য যন্ত্র লইয়া কাজ করিতে হইত। পরিশ্রমের ও সাধনার পুরস্কার লাভ করিতে বিলম্ব হইল না; আর্ট স্কুলের পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ করিয়া তিনি বৃত্তি অর্জ্জন করিতে পারিলেন। তাহাতে নির্ভর করিয়া তাঁহার পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইল। তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তখন আর্ট স্কুল ও তাহার চিত্রশালা কলিকাতা বহুবাজারে ছিল এবং জবিন্স ও ওঘিলার্ডি—দুই জন য়ুরোপীয় যথাক্রমে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ছিলেন।

আর্ট স্কুলে শিক্ষালাভ কালেই শশিকুমারের উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য ইটালীতে যাইবার প্রবল বাসনা জন্মে। তাঁহার মত দরিদ্রের পক্ষে সে বাসনা পূর্ণ করা আশাতীত বলিয়া অনেকে তাঁহার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া ব্যঙ্গ করিতেন। কিন্তু ঐ ব্যঙ্গবিদ্রূপ তাঁহাকে নিরুৎসাহ না করিয়া তাঁহার উৎসাহ-বৃদ্ধির কারণ হইত। শেষে তাঁহার মনে হইল, কোনরূপে

পাথেয় সংগ্রহ করিতে পারিলেই তিনি ইটালী যাত্রা করিবেন। তথায় যাইয়া কিরূপে তাঁহার বাসের ও শিক্ষালাভের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে তাহাও তিনি বিবেচ্য বলিয়া মনে করিলেন না। ইটালীতে গমন যেন তাঁহার দিবসের চিন্তা ও রাত্রির স্বপ্ন হইয়া উঠিল।

এই সময় ঘটনাক্রমে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের একখানি ছবি পাইয়া তিনি তাহা দেখিয়া Black and White একখানি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া তাহা লইয়া মনোমোহনের নিকট গমন করেন। শশিকুমারের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মনোমোহন বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে মুক্তাগাছার জমিদার (মহারাজা) সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর একখানি ফটো দিয়া তাহা অবলম্বন করিয়া একখানি বৃহৎ চিত্র অঙ্কিত করিতে উপদেশ দেন। মনোমোহনই তাহা সূর্যকান্তকে উপহার দিয়া চিত্রকরের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। সূর্যকান্ত তখন শিল্পীকে অর্থসাহায্য দান করিবেন বলেন।

ইহার পরেই শশিকুমার সন্তোষের জমিদার-পত্নী জাহ্নবী চৌধুরাণীর একখানি তৈলচিত্র ও তাঁহার নির্দ্দেশে তাঁহার পরিবারের কয় জনের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া ছয় শত টাকা পারিশ্রমিক লাভ করেন।

ঐ টাকা সম্বল করিয়া শশিকুমার ইটালী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন এবং সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত সূর্যকান্তের অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া বোম্বাই-এ টেলিগ্রাফ করিয়া ইটালী যাইবার জন্য জাহাজে তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রীর টিকিট ক্রয় করেন। যাইবার সময় তিনি সূর্যকান্তকে অনুরোধ জানাইয়া যান—বিদেশে তিনি যেন অনাহারে প্রাণ না হারান।

শশিকুমারের ইটালী যাত্রা সম্বন্ধে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ জবিন্স ও শিক্ষক ওঘিলার্ডি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। আর্ট স্কুলের পরীক্ষাশেষে শশিকুমার যে সার্টিফিকেট লাভ করেন জবিন্স তাহাতে লিখিয়া দেন—যুবকটি চিত্র-বিদ্যার অনুশীলন করিবার জন্য ইটালীতে যাইতে অভিলাষী—এ কার্যে তিনি লোকের উৎসাহ ও সাহায্য লাভের উপযুক্ত পাত্র। শিক্ষক ওঘিলার্ডি তাঁহাকে রোমের "রয়্যাল একাডেমির" নিয়মাবলী আনাইয়া দেন ও কলিকাতায় ইটালীর রাজদূতের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। রাজদূত তাঁহাকে ইটালীতে কয় জন পদস্থ ব্যক্তির নিকট পরিচয়-পত্র দেন। তখন শশিকুমার ইটালীয়ান ভাষা জানিতেন না—সেইজন্য রাজদূতের এক উড়িয়া ভৃত্যের সাহায্যে তাঁহার সহিত রাজদূতের আলোচনা হইয়াছিল।

শশিকুমার বোম্বাই নগরে উপনীত হইলে তথায় ইটালীর যে রাজদূত ছিলেন, তিনি তাঁহাকে ইটালীতে কয় জনের নিকট ও যে জাহাজে তিনি যাইবেন সেই জাহাজের অধ্যক্ষকে পত্র দেন।

শশিকুমারের ধারণা ছিল, জাহাজে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরাও কামরা পায়। কিন্তু জাহাজে উঠিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে জাহাজের পাটাতনে (ডেকে) থাকিতে হয়। ঐভাবে দীর্ঘপথ অতিবাহন কিরূপ কষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক

গোপাল লাল ঠাকুর—শোনা যায় এই ছবিটিও শশিকুমার অঙ্কিত।

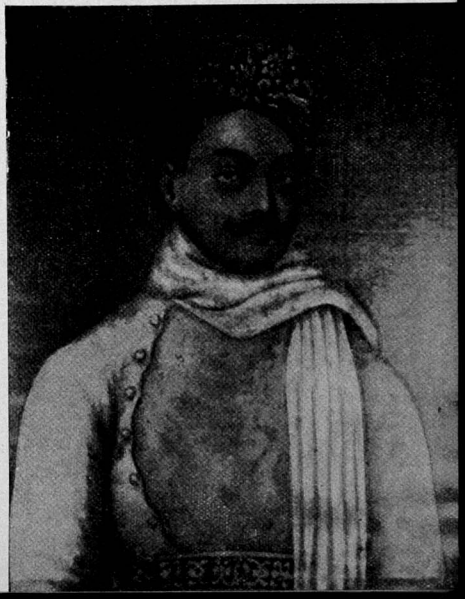

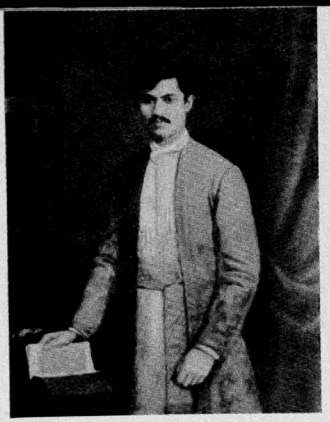

স্বনামধন্য চিত্রকর আর্চার অঙ্কিত সৌতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতিকৃতি। —কথিত আছে, কিছুকাল এঁর সহিত শিল্পী শশী হেশ লণ্ডনে ছিলেন।

তাহা অনুভব করিয়া সহৃদয় অধ্যক্ষ শশিকুমারকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে থাকিবার অনুমতি প্রদান করেন।

জাহাজেই শশিকুমার বুঝিতে পারেন, ইটালীয়ান বা ইংরেজী একটি ভাষা না জানিলে বিদেশে লোকের সঙ্গে আলাপ করা অসম্ভব। ইটালীয়ান তিনি জানিতেন না, ইংরেজীতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি যৎসামান্য ছিল, সেইজন্য জাহাজেই তিনি ইংরেজী লিখিতে আরম্ভ করেন ও এক মাস পরে জাহাজ যখন ইটালীর বন্দরে উপনীত হয়, তখন তিনি ইংরেজীতে আপনার বক্তব্য ব্যক্ত করিতে সমর্থ।

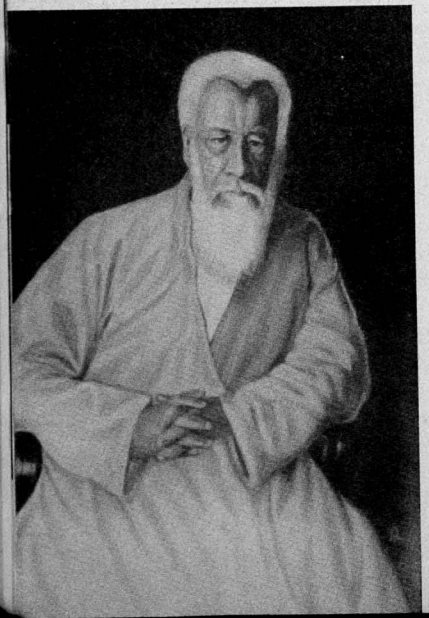

শশিকুমার যখন রোমে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার সম্বল মাত্র ৯০ টাকা।

তখন রোমের রয়াল একাডেমির নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র গ্রহণ শেষ হইয়াছে এবং ইটালীয়ান ভাষা না জানিলে কোন ছাত্রকে তথায় গ্রহণ করা হয় না। বহু চেষ্টায় এবং তিনি তিন মাসের মধ্যে ইটালীয়ান ভাষা শিখিয়া শিক্ষামন্ত্রীর সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার পরিচয় দিবেন, এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া তিনি রয়াল একাডেমিতে প্রবেশের অনুমতি লাভ করিলেন। এ বিষয়ে রোমে তুরস্কের রাজদূত তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। বলা বাহুল্য, ইটালীয়ান ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে শশিকুমার তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

শিল্পী শশী হেশ অঙ্কিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শশিকুমার রোমের রয়াল একাডেমিতে প্রায় দুই বৎসর চিত্রবিদ্যার অনুশীলন করেন। তিনি তাহার পরে প্রথমে ফ্রান্সের প্যারিস সহরে ও পরে জার্ম্মানীর মিউনিকে বিদ্যানুশীলনের পরে য়ুরোপের আরও কয়টি দেশের চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়া ১৩০৬ বঙ্গাব্দে লণ্ডনে উপস্থিত হন। তথায় রমেশচন্দ্র দত্ত ও শরৎকুমার মল্লিক তাঁহাকে নানারূপে সাহায্য করেন।

লণ্ডনে "ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটে"—য়ুরোপে ও ইংলণ্ডে শিল্পবিষয়ক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে শশিকুমারের একটি প্রবন্ধ যে সভায় শরৎকুমার মল্লিক পাঠ করেন,

তাহাতে সার জর্জ্জ বার্ডউড সভাপতি ছিলেন। এই প্রবন্ধের বিবরণ দিতে যাইয়া কলিকাতায় 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রের ইংলণ্ডের সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন—ক্রিকেট খেলায় কৃতিত্বলাভকারী প্রিন্স রন্‌জী ও র‍্যাংলার পরঞ্জপের সহিত শিল্পী শশিকুমারের নামোল্লেখ করিতে হয়। সার উইলিয়ম হাণ্টার 'টাইমস' পত্রে শশি-কুমারের শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা করেন। তথায় তিনি একাধিক ইংরেজের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া তাঁহাদিগের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে শশিকুমার রমেশচন্দ্র দত্ত ও শরৎকুমার মল্লিক এই দুই জনের সাহায্যে বহু লোকের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাদাভাই নৌরজী তথায় যেমন তাঁহাকে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তেমনই এ দেশে থাকিয়া তাঁহাকে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়াছিলেন।

শশিকুমার ১৩০৬ বা ১৩০৭ বঙ্গাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। 'সঞ্জীবনী' পত্রে তিনি ইটালী প্রবাসীর পত্রে সে দেশের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত করিয়াছিলেন।

তিনি যখন স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন তাঁহাকে যিনি প্রথম সাহায্য দান করিয়াছিলেন, সেই বিন্ধ্যবাসিনী চৌধুরাণী তাঁহার পুত্র প্রমথনাথ ও মন্মথনাথকে লইয়া কলিকাতায় (বিডন ষ্ট্রীটে) বাস করিতেছিলেন। পরবর্ত্তীকালে প্রমথনাথ সাহিত্য-সেবায় ও মন্মথনাথ রাজনীতি চর্চ্চায় যোগ দেন। শশিকুমার ও তাঁহার (ইটালীয়ান) পত্নী কলিকাতায় তাঁহাদিগের গৃহেই প্রথম আশ্রয় পাইয়াছিলেন।

তিনি স্বদেশে ফিরিবার পরে তাঁহাকে কাজের জন্য চেষ্টা করিতে হইতে থাকে। তিনি ফিরিয়া আসিবার পরেই উহার পরিচয় দিয়া লিখিত কোন প্রবন্ধে বলা হইয়াছিল :—

(১) "এ দেশে তিনি কিরূপ প্রতিপত্তি লাভ করেন, তাহা দেখিতে অনেকেই উৎসুক আছেন।"

(২) "তিনি সবে ইউরোপে থাকিয়া চিত্র-বিদ্যার বিবিধ প্রণালী শিখিয়া আসিয়াছেন, কার্য-

কালে তাঁহার প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাইতে এখনো বিলম্ব আছে। তাঁহার বয়স অনূর্দ্ধ ত্রিংশৎবর্ষ মাত্র। কিন্তু এই যুবকটির এই অনতিপরিসর জীবনের মধ্যেই এত ক্লেশসহিষ্ণুতা, উদ্যমশীলতা ও স্বাবলম্বনের পরিচয় পাওয়া যায় যে, আজকালের এই ইউরোপ আমেরিকা জাপান যাত্রার দিনেও কঠোর জীবন-সংগ্রামের সময় তাঁহার জীবনী আলোচনায় ইষ্ট বই অনিষ্ট হইবে না।"

লেখকের মনে যে সন্দেহ এই সকল উক্তিতে স্বপ্রকাশ হইয়াছিল, কার্যকালে তাহাই মূর্ত্ত হইয়াছিল, বলা যায়।

যে আশা দেশের লোক তাঁহার শিক্ষাতীক্ষ্ণ শিল্পনৈপুণ্যহেতু করিয়াছিল, তাহা পূর্ণ হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। তিনি যে এ দেশে ফিরিয়া কয়খানি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া কিছু অর্থ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি।

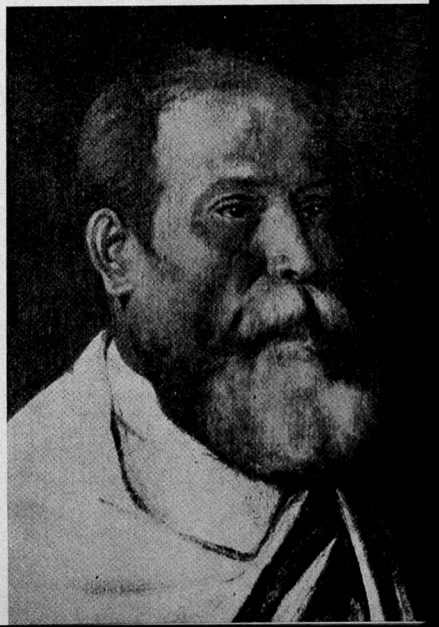

শশিকুমার অঙ্কিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

আমরা জানি, তিনি বিন্ধ্যবাসিনী চৌধুরাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কবি প্রমথনাথ চৌধুরীর ও অন্য কয়জনের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আগমনে কেন কোনরূপ সাড়া পড়ে নাই এবং অল্প দিনের মধ্যেই যেন তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ইহার কারণ কি ?

তখনও বাঙ্গালায়—(বাঙ্গালা তখন অবিভক্ত) ধনীর অভাব ছিল না ; ধনীরা শিল্পীদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—সঙ্গীতে, চিত্রবিদ্যায়, মন্দির ও গৃহ নির্ম্মাণে, স্থাপত্যে—নানা বিষয়ে তাঁহারা অর্থব্যয় করিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, একজন মহিলার পৃষ্ঠপোষকতাই শশিকুমারের ইটালী যাত্রা সম্ভব করিয়াছিল। বিশেষ তখন গৃহসজ্জার অঙ্গ হিসাবে পূর্ব্বপুরুষ প্রভৃতির বৃহৎ তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা প্রথায় পরিণত হইয়াছিল। সেজন্য বিদেশ হইতে চিত্রকররা সময় সময় এ দেশে আসিতেন—কেহ কেহ এ দেশেই থাকিয়া অর্থার্জ্জন করিতেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে "দরবারে"র সময় এ দেশে আসিয়া চিত্রকর ভ্যাল প্রিন্সেপ কিরূপে সামন্ত রাজ্যের শাসক প্রভৃতির প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার "Imperial India—An Artist's Journal" পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। হয়ত তখনও য়ুরোপীয় চিত্রকরদিগের আদর অনেকের মনে কুসংস্কারের মত বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু এ দেশের চিত্রকরগণও যে কাজ জানতেন—আর্ট স্কুলের অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর আদরে তাহা প্রতিপন্ন হয়। আরও কোন কোন বাঙ্গালী চিত্রকরের উল্লেখ করা যায়। সুতরাং শশিকুমার কেন যথেষ্ট আদর লাভ করেন নাই, তাহা বলা যায় না। হয়ত তাঁহার প্রতিভার সঙ্গে "গৃহিণীপনার" সমন্বয় ছিল না। হয়ত তিনি—বিদেশে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া আসিয়া যে পারিশ্রমিক পাইবার আশা করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণের বিবেচনায় অসঙ্গত। হয়ত তিনি অবস্থার সহিত ব্যবস্থার সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারিতেন না। হয়ত পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কারণে তাঁহার মানসিক শান্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।

সে সকলের আলোচনা করিয়া লাভ নাই। কিন্তু আবশ্যক কাজ ও আদর না পাইলে শিল্পীর প্রতিভা যে ম্লান হয়—কুসুমের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যেমন সূর্য্যালোক ও বায়ু প্রয়োজন শিল্পপ্রতিভার স্ফূর্ত্তির জন্য যে তেমনই কাজ ও আদর প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবিষয়ে প্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক কনভয়ের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"No great painter ever painted a picture for the purpose of living in delighted contemplation of his own finished work, no sculptor would care to spend his life in a gallery of his own statues. Painters and sculptors must work for others. Dimly in the background of their mind, throughout their work they must have some ideal recipient, in view—an ideal recipient, the counterpart of themselves, capable of fully perceiving the beauty it is their aim to render, capable of thrilling responsive to the thrill of conception that they themselves experienced."

আর মনে হয়, শশিকুমার প্রতিকৃতি অঙ্কনেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন—চিত্রাঙ্কনের অন্য কোন বিভাগে অবহিত হইবার অবসর তাঁহার ঘটে নাই।

শশিকুমার যে সময়ে পথপ্রদর্শকের কাজ করিয়াছিলেন, তখনও এ দেশে শিল্পসমিতি গঠিত হয় নাই—বৎসর বৎসর প্রদর্শনীর আয়োজনও হইত না। পরবর্ত্তী কালে, প্রধানতঃ মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের চেষ্টায়, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়।

বহু দিন—বহু বর্ষ তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই। তাহার পর সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছিলাম ; তাহাতে এক ভদ্রলোক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন—শশিকুমার তখনও জীবিত। তিনি চিত্রাঙ্কন ত্যাগ করিয়াছেন—আবার স্বগ্রামে ফিরিয়া যাইয়া গ্রাম্য জীবন যাপন করিতেছেন—বাল্যকালে যেমন ছাতার লোহার ডাঁট লইয়া উৎকৃষ্ট বড়শী প্রস্তুত করিতেন, তেমনই বাঁশের টুকরা লইয়া পাখী মারিবার "গুলতী" প্রস্তুত করেন।

সবিশেষ বিবরণ জানাইবার জন্য পত্রলেখককে পত্র লিখিয়াছিলাম, উত্তর পাই নাই। তাহার পরে দেশ সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভক্ত হইয়াছে—তিনি যে গ্রামে ছিলেন, তাহা পাকিস্তানভুক্ত হইয়াছে।

শশিকুমারের সব সংবাদ দিতে পারেন, এমন কি কেহই নাই ?

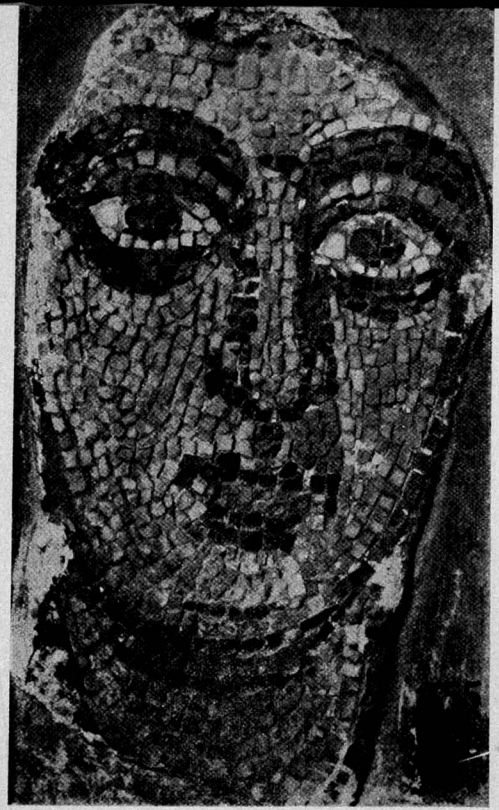

মুখ ঃ বাইজাণ্টাইন চিত্র (নয় শতক)।

ছবি দেখতে শেখা

অশোক মিত্র

যে কোন দেশের, যে কোন কালের, চিত্রকলার রসাস্বাদ কি ভাবে করতে হয়, সেই রসাস্বাদের মূলে কি কি থাকে, এই লেখায় তার অবতারণা করা হয়েছে। প্রথমভাগে আমরা খুব সংক্ষেপে চিত্ররসের সাধারণ লক্ষণগুলি নিয়ে আলোচনা করব। দ্বিতীয়ভাগে বলব কেমন করে চিত্রের বিচার করতে হয়, কি করে যে কোন ছবি ভাল করে দেখে তার থেকে আনন্দ পেতে হয়। তৃতীয় ভাগে, ছবি কি করে আঁকা হয়, ছবি আঁকার বিভিন্ন রীতি পদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করে, যে কোন ছবি কিভাবে বিশ্লেষণ ও বিচার করতে হয় তার কয়েকটি উদাহরণ দেব। এ-থেকে কোন কারণেই পাঠক যেন না মনে করেন যে চিত্র-বিচার

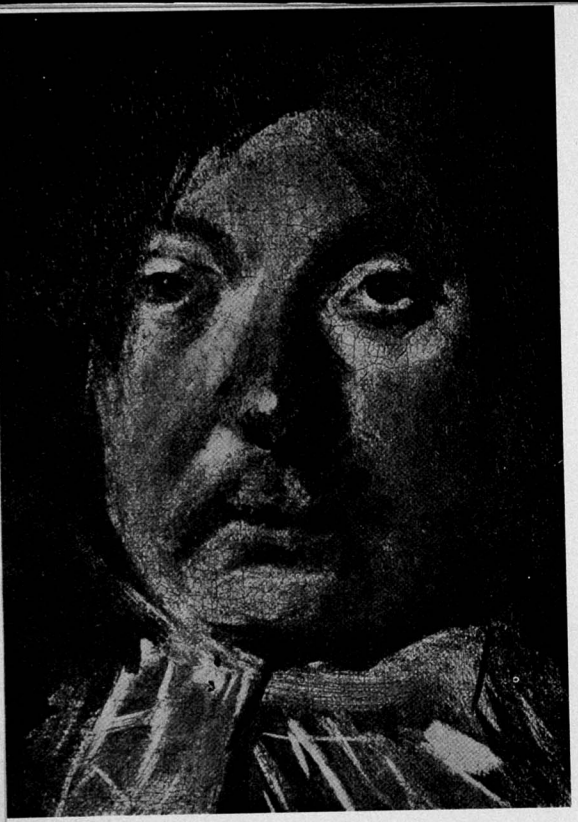

হ্যাল্‌স্‌ : অনাথাশ্রমের
জনৈক কর্তৃপক্ষের মুখ।

অথবা রসাস্বাদের একমাত্র পথের নির্দেশ দেবার স্পর্ধা এই লেখার কোথাও করা হয়েছে। যেখানেই কোন মতামত জোর করে বলা আছে, সেটা তিনি অনেক মতের মধ্যে একটি মত বলেই যেন ধরেন। কোন মতই চূড়ান্ত মত হতে পারে না, ঠিক যেমন সৃষ্টির কোন ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত ব্যাখ্যা হতে পারে না।

রসাস্বাদ কথাটিকে এখানে ইংরেজিতে ইস্‌থেটিক এক্‌স্‌পিরিয়েন্সের সামিল করা হয়েছে। চিত্রকলার প্রকৃত রসাস্বাদের পথে আমাদের অনেক বাধা উপস্থিত হয়। আমরা যে সমাজে বাস করি সে সমাজ শিল্প-কলা সম্বন্ধে উদাসীন। সেই সমাজে প্রত্যহ বাস করার ফলে আমাদের অগোচরে যে সমস্ত অভ্যাস এবং ধ্যানধারণা আমাদের চৈতন্যকে আবৃত করে, কালক্রমে সেগুলি রসাস্বাদের পথে বিশেষ অন্তরায় হয়ে ওঠে। যখন চিত্ররস-বহির্ভূত অন্যান্য কারণ এসে রসবোধের পথ আটকিয়ে দাঁড়ায়, তখন সেগুলি আমাদের প্রায়ই ভুল পথে

নিয়ে যায়, বিভ্রান্তি ঘটায়, রসের মূল্যবিচারে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে। ব্যবহারিক, ভাবাবেগজাত অথবা সামাজিক বিচারে দুর্নীতি সুনীতির মূল্যবোধ চিত্ররসের প্রকৃত বিচারে অনেক সময়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং ছবির প্রকৃত মূল্য কিসে আসে সে বিচারের আগে কিসে সে মূল্য কোনমতেই আসে না প্রথমেই সেটুকু স্পষ্ট করে বলা দরকার।

চোখে যেমনটি দেখছি তার যথাযথ ফোটোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা ছবির কাজ নয়। বিষয়বস্তুর নিখুঁত হুবহু প্রতিচ্ছবি, অথবা নথি প্রমাণ হিসাবে সার্থকতা অসার্থকতা ছবির আসল মূল্য নয়। নিছক অনুকরণে বিষয়বস্তুর আসল সত্তা অথবা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ফুটে বেরোয় না, আর যার মূল্য নথি বা প্রমাণ হিসাবেই মুখ্য, তারও ব্যবহারিক মূল্যই প্রধান। বাহ্য গুণাগুণ এবং লক্ষণ ক্যামেরা খুব ভালভাবেই নথিবদ্ধ করে, কিন্তু বাহ্যরূপের অন্তরে কি লুকিয়ে আছে তার সন্ধান ক্যামেরা দিতে পারে না। আর আমরা ছবির কাছে ঠিক এইটেই দাবী করি। বস্তুর বাহ্যরূপের তলায় কি গুণাগুণ আছে, তাদের স্বরূপ কি, কোন ঘটনা বা বিশেষ অবস্থার অন্তর্নিহিত মূল্য, তাৎপর্য কি, চিত্রে আমরা তাই দেখতে চাই, তারই রসসৃষ্টির মাধ্যমে অভিভূত হতে চাই। অর্থাৎ আমাদের সাহায্য না করলে, আমাদের না দেখালে আমরা নিজে নিজে যা কোনদিন দেখতে পেতুম না, চিত্রশিল্পী আমাদের সেই জিনিষ দেখতে শেখান, সে বিষয়ে চোখ খুলে দেন। এইভাবে দেখতে শেখাতে গিয়ে, চোখ খুলে দিতে গিয়ে, তাঁকে কতকগুলি ব্যবস্থার সাহায্য নিতে হয়: যেমন সাধারণ জিনিষ যেভাবে সাজানো দেখতে আমরা অভ্যস্ত তাদের চিরাচরিত রূপ এবং আকার তিনি কিছুটা বদলে দেন ; তার পরিবর্তে তাদের এমনভাবে সাজান, তাদের এমন এক রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করান যা হয়ত ফোটোগ্রাফির দিক দিয়ে মোটেই যথাযথ নয়। উপরন্তু চিত্রশিল্পীর কাছে আমাদের দাবী বেড়েই চলে। যেমন, আমরা

পম্পিয়াই : ভীতসন্ত্রস্তা নারী
(রহস্যগৃহ, অনুমান খৃষ্টপূর্ব ৫০)

প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রে আশা করি যে শিল্পী তাতে প্রকৃতির প্রাণরহস্যের আভাস দেবেন। প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেটে আশা করি যে শিল্পী যাঁর প্রতিকৃতি এঁকেছেন তাঁর চরিত্রটি বা বিশিষ্ট লক্ষণগুলি ঠিক মত ফুটিয়ে তুলবেন। বলা বাহুল্য, এসব আভাস বা লক্ষণ ক্যামেরার নাগালের বাইরে—নথি দলিলের মধ্যে কোনমতেই আবদ্ধ থাকবার নয়। এসব বিষয় নিতান্তই শিল্পীর নিজস্ব বিচারবোধের কথা।

একটা নিতান্ত ভুল ধারণা খুব প্রচলিত আছে। সাধারণত লোকের ধারণা যে ছবিতে একটি গল্প থাকা চাই, আর শিল্পীর উৎকর্ষ প্রমাণ হয় সেই গল্পটি তিনি কত ভাল করে রসিয়ে, অথবা নীতিসুধারসে সিঞ্চিত করে বলতে পারেন—তার উপর। এ ধারণা অন্যায়ও নয় অস্বাভাবিকও নয়। তার কারণ আমরা সকলেই জীবন সম্বন্ধে আগ্রহশীল, এবং বাস্তব জীবনে জিনিষ বা বাস্তব ঘটনা আমাদের মনে যে কৌতূহলের সৃষ্টি করে ছবিতেও আমরা অনেক সময়ে তা প্রতিফলিত দেখতে চাই। সার্থক চিত্রে গল্প থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে; যদি থাকে তবে চিত্রবিচারে সেটা অধিকন্তু। কারণ ছবির একমাত্র সত্য বিচার হয় রসোত্তীর্ণ প্ল্যাস্টিক শিল্প-সৃষ্টির কাজে শিল্পী তাঁর উপাদান কতখানি সার্থকভাবে নিয়োগ করেছেন তার উপর; সেখানে ছবির আখ্যানটি কতখানি সার্থক ভাবে বলা হয়েছে অথবা তার নীতি উপদেশটি কত মহৎ সে প্রসঙ্গ অবান্তর। মুস্কিল হয় যখন এই বিভিন্ন বিচারের জগৎগুলি আমরা গুলিয়ে ফেলি: অর্থাৎ চিত্রের সাহিত্যিক মূল্য বা নীতিগত মূল্য আমরা তার চিত্রগত মূল্যের তুল্যমূল্য বলে ভুল করি; ছবিকে সাহিত্যিক রস বা সুনীতি প্রচারের ক্ষেত্র বলে ধরে নিই। এবং দেখা যায় প্রায় ক্ষেত্রেই অধিকাংশ লোকের পক্ষে এই ভ্রমটিই দুস্তর বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

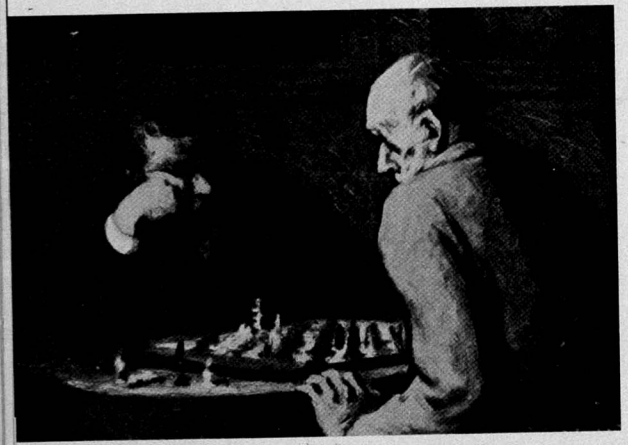

দমিয়ে : দাবা খেলা।

চিত্ররসানুভূতির পথে আরেকটি খুব বড় অন্তরায় আছে। আমরা সাধারণত নিছক নৈপুণ্য, কৌশল, ওস্তাদি, বাহাদুর কাজকে রসোত্তীর্ণ শিল্পের সামিল করি, ভাবি যে কাজে যত কৌশল ও দক্ষতা থাকবে ততই তা রসোত্তীর্ণ শুদ্ধ শিল্প হবে। এরকম ভুলকে খুব দোষ দেওয়া যায় না, কারণ চিত্রকলা তো শুধু সৃজনী-প্রতিভার প্রকাশ নয়, তার মধ্যে কারিগরিও যথেষ্ট থাকে; চিত্রশিল্প এক ধরনের হাতের কাজ, বিশেষ এক ধরনের টেকনিক আয়ত্ত ও প্রয়োগের মধ্যেই তার প্রকাশ হয়। অন্যান্য হাতের কাজের কারিগরির মতই ছবি আঁকার ব্যাপারে স্বভাবপটুত্বের সঙ্গে চাই শিক্ষা; তার উপরে অনুশীলন থাকলে মানুষ আস্তে আস্তে রঙের তুলি ব্যবহার করতে শেখে। সুতরাং শতেক কারিগরের মধ্যে যেমন এক-আধজনই ওস্তাদ বা সেরা কারিগর হতে পারে, তেমনি শত শত নিপুণ চিত্রকরের মধ্যে এক-আধজনই সত্যকারের ভাল চিত্রশিল্পী হতে পারেন। ছবিতে এইসব টেকনিক্যাল কৌশল চেনবার বিদ্যা

ভান গথ : চেয়ার, পাইপ, রুমাল।

আয়ত্ত করা খুব কঠিন নয়; কিন্তু টেকনিক্যাল কৌশল-প্রসূত কাজের মধ্যে কোন্‌টি মহৎ, কোন্‌টি বা মামুলি তা চেনবার বিদ্যা আয়ত্ত করা সত্যই শক্ত—শত শত নিপুণ কাজের মধ্যে কোন্‌টি শিল্পীর প্রতিভামণ্ডিত, অভ্রান্ত চোখে তা বার করা খুবই কঠিন। চিত্রশিল্পে শুধু নৈপুণ্য এবং কৌশল খোঁজা, আর পাণ্ডিত্যাভিমান বা অ্যাকাডেমিক দক্ষতা সম্বন্ধে ভক্তি একই কথা; তাতে মানুষ শাঁসটি ফেলে খোসাটি ধরে, কায়ার বদলে ছায়াকে সত্য মনে করে, সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেয়।

দ্বিতীয় ভুলটি প্রথম ভুলের চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক। কারণ শিক্ষার্থী যখন প্রথম ছবি দেখতে সুরু করে বর্ণনা, আখ্যান, সাহিত্যিক রস, বা ফোটোগ্রাফসুলভ যথাযথ্যের সঙ্গে চিত্ররসের গোলমাল করে ফেলেন, তখন সেটা খুব মারাত্মক দোষ হয় না এই হিসাবে যে তিনি জানেন যে তাঁর ভুল হবে, কারণ তিনি সবে শিখছেন। কিন্তু অ্যাকাডেমিশিয়ান বা অ্যাকাডেমিক শিল্পী অথবা সমালোচক, যিনি মহারথীদের কাজের কৌশল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তিনি মনে করেন তিনি সব শিখে ফেলেছেন, তাই তাঁর মন নিছক চিত্র-কৌশল বা টেকনিক ছাড়া অন্য সব কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে; তিনি খোলা মনে, অনাবৃত চোখে দেখতে ভুলে যান। অতীতের প্রাণস্পন্দন ও আত্মা অতীতের সৃষ্টিরূপে ও ফর্মে যেভাবে আবদ্ধ আছে তাঁর চোখ শুধু তাতেই নিবদ্ধ থাকে; ফলে তাঁর সমসাময়িক কাজে তিনি সেই প্রাণের স্ফুরণ, প্রকাশ ও ব্যঞ্জনাকে অবহেলা করেন, এমনকি তাঁর চোখে আঙুল দিয়ে সেইসব অভিব্যক্তি দেখিয়ে দিলেও তিনি তা দেখতে চান না, স্বীকার করতে চান না। ঠিক এই কারণেই যুগে যুগে শিল্পজগতে যে সব নিত্য নতুন আন্দোলন হয়েছে তার সবচেয়ে দুর্ধর্ষ শত্রু হয়েছেন অসহিষ্ণু, বিরুদ্ধবাদী, কুৎসাব্রতী পণ্ডিতম্মন্য অ্যাকাডেমিশিয়ানের দল, অনুৎসুক জনসাধারণ নয় - কারণ জনসাধারণ জানতে বা বুঝতে পারে না যে এই ধরনের পণ্ডিতরা যা বলেন তা শুধু চিত্রের কলা-কৌশল বা টেকনিক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, তার শুদ্ধ শিল্প-সত্তা সম্বন্ধে নয়; ফলে তারা সেসব কথা শুনে খুব চমৎকৃত হয়। অবশ্য পণ্ডিতদের উক্তি জ্ঞানত দুরভি-সন্ধিজাত নাও হতে পারে, এবং খুব সম্ভব নিশ্চয়ই দুরভিসন্ধিপ্রণোদিত হয় না। তার কারণ যিনি চিরকাল পুরনো, চেনা জিনিষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন, তাঁর কাছে যে কোন নতুন জিনিষের নতুনত্বই সবিশেষ পীড়াদায়ক হয়, বিরক্তি ঘটায়। পুরনো, বহুযত্নে

রুয়াণ্ট : বৃদ্ধ রাজা।

সঞ্চিত বহুমূল্য অভ্যাসের মূলে টনক নড়ে, যুদ্ধ ঘোষণার সোরগোল পড়ে যায়। যে সব বিচারের রায় অনেকদিন জারি হয়ে গেছে, সে সব সিদ্ধান্তের সঙ্গে বহুদিন ধরে অ্যাকাডেমিক পণ্ডিত একমত থাকার দরুণ তাঁর কাছে তখন সেসব অভিমত অতি প্রিয় হয়ে গেছে; সেগুলি ঝেড়ে ফেলা বা উল্টে দেওয়া তাঁর পক্ষে তখন খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তখন স্বাভাবিক জাড্য ও স্থবিরত্বের সঙ্গে অহঙ্কার এসে যোগ দেয়। দুইয়ে মিলে, যা মৃত তার পক্ষ নিয়ে, যা জীবন্ত তার বিরুদ্ধাচরণ করে।

জনসাধারণ কোনদিন প্রকৃতপক্ষে ঠিকমত দেখতে শেখেনি বলেই এই সব ভুল ও গোলমাল আরও প্রশ্রয় পায়। সাধারণ লোক চেনাজানা জিনিষ চিনতে পারে; তার মধ্যে কোন্ কোন্ লক্ষণগুলি ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগবে অথবা বাস্তব জীবনে ভাবাবেগের সহায় হবে তা সে জানে; কিন্তু এই ধরনের চেনা বা জানার সঙ্গে প্রকৃত দৃষ্টি বা অনুভূতির কোন সম্বন্ধ নেই। সাধারণ লোক একটিকে অবলম্বন করে অন্য আরেকটি বিষয়ে যাবার সোপান হিসাবে যে কোন জিনিষকে চেনে বা জানে, যেমন তা কি প্রয়োজনে লাগে, তার পরিণাম কি, ইত্যাদি; অথবা হয়ত কোন জিনিষ নিতান্ত ব্যক্তিগত কোন ভাব বা কল্পনার উদ্রেক করে, যার সঙ্গে জিনিষটির আসল নিজস্ব চরিত্রের কোন সম্পর্ক নেই। সাধারণ লোকের ধারণা, যে-কোন উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির মধ্যে নিশ্চয় কোন গূঢ় রহস্য বা গুপ্তমন্ত্র নিহিত থাকে; সেটি যতক্ষণ না প্রকাশ হচ্ছে, জানা যাচ্ছে, ততক্ষণ শিল্প বস্তুটি বোঝবার উপায় নেই। এরকম ধারণা যদিও নিতান্ত আজগুবি, তবুও তার মধ্যে একটি বড় সত্য লুকিয়ে থাকে; সেটি হচ্ছে যে, যে কোন জিনিষ প্রথম দেখা মানেই তাকে নতুন করে জানা চেনার প্রশ্ন আসে, অর্থাৎ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত সেটি আপনা-আপনি জানা অথবা শেখা হয়ে যায় না, চেষ্টা করে জানতে হয়, শিখতে হয়।

নতুন জিনিষ নতুন করে দেখতে শেখা কত দরকার সেকথাটা আমরা সর্বদা মনে রাখি না। কিন্তু অনুভূতি সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের গোড়ার কথাগুলি একটু বললেই এর যথার্থতা প্রমাণ হবে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে অনুভূতির যন্ত্র বা বহির্জগতের সংযোগদ্বার। বিশ্বজগতের যে সব ছাপ আমাদের উপর অহরহ পড়ে তাদের এমনিতে কোন মূল্যই থাকে না, যতক্ষণ না

জত্তো: খৃষ্টের জন্ম।

হ্যাল্স: অনাথাশ্রমের কর্তৃপক্ষ।

তাদের আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি, মানে বার করতে পারি। ব্যাখ্যা তখনই সম্ভব হয় যখন আমরা স্মৃতিতে যে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে তাদের মধ্যে থেকে কতকগুলি স্মৃতি বেছে বেছে টেনে বার করে নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে তার মূল্য নিরূপণ করি। যে কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে আমাদের যতগুলি অনুভূতি একসঙ্গে ভিড় করে আমাদের কাছে স্বীকৃতি দাবী করে তাদের সবগুলি একত্র করলে তার যোগফল নিতান্ত এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করে; অজস্র রকমের দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, শীতাতপবোধ, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য অস্বাচ্ছন্দ্য, ইত্যাদি চারদিকে অহরহ আক্রমণ চালায়; তাদের অধিকাংশের মধ্যেই কোন সম্বন্ধ নেই, পারম্পর্য নেই; তারা সবাই মিলে কিছুতেই একটি একক অভিজ্ঞতায় স্থান পেতে পারে না। অতএব কোন একটি বিষয়ে চেতনাশীল হতে হলে, মগজ সুস্থ রাখতে হলে, এই সব অনুভূতির অধিকাংশই বাদ দিতে হয়; ওরই মধ্যে মাত্র কয়েকটিকে বাছতে হয় যা নাকি বোধগম্য কোন ছক বা ছবির মধ্যে পড়ে। কিন্তু এইভাবে অনুভূতিকে বোধগম্য করতে হলে, যেসব যোগসূত্রের দরকার হয় সে সবই পুরনো অভিজ্ঞতার থলি থেকে বেরোয়; এই অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে স্মৃতিতে; যখন যেমন দরকার পড়ে তখন তেমন অভিজ্ঞতার উপর তলব পড়ে। সেই অভিজ্ঞতার বলে বর্তমান অবস্থার কতকগুলি বিশেষ দিকের প্রতি আমরা নজর দিই; সেই অভিজ্ঞতার জোরেই তাদের মধ্যে আমরা বিশেষ কোন রূপ বা ফর্ম এবং অর্থ পাই, অর্থাৎ সে অবস্থাটিকে বুঝি, অনুভব করি।

ফাইয়ুম চিত্র: পোর্ট্রেটের চোখ।

আমরা সকলেই কোন না কোন সময়ে অপরিচিত অবস্থায় পড়েছি, ফলে চারদিকে কি ঘটছে তার সামান্যই বুঝতে পেরেছি। যেমন প্রথম যখন জাহাজে চড়ি তখন তার খোলের মধ্যে কি যন্ত্রপাতি চলছে তা জানি না; চারিদিকে বিদেশী ভাষায় আলাপ চললে বুঝতে পারি না; যাদের কোন দিন দেখিনি তাদের খাওয়া পরা, বসা, চালচলন, আচার-ব্যবহার সবই বিদ্‌ঘুটে লাগে। সব যেন গোল লেগে যায়, অস্পষ্ট হয়। না পারি সবটা দেখতে, না পারি বুঝতে, তাতেই মুস্কিল হয়। ওরই মধ্যে সামান্য যেটুকু দেখি, শুনি, চিনি, যেমন জাহাজের চাকা বা বড় বড় পাইপ, স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, ভাবভঙ্গী, তাতে খুব অস্পষ্ট একটা বোধ আসে, কিন্তু প্রথমে বেশির ভাগই আমাদের ফাঁকি দেয়। পরে যখন আস্তে আস্তে বোধের উদয় হয়, তখন আমাদের অনুভূতি স্পষ্ট হয়, সমুখের দৃশ্যপটে অনেক বেশি জিনিষ নজরে পড়ে। কিন্তু তখনও যা দেখি তা খুবই অল্প, অস্পষ্ট, তাতে পরিপ্রেক্ষিত থাকে না। যেগুলি বেশি প্রয়োজনীয় বা তাৎপর্যময় তা অনেক সময়ে আমাদের ফাঁকি দেয়, তখনও যেসব টুকিটাকি নজরে পড়ে তা তালগোল পাকিয়ে যায়। তার মানে এ নয় যে যিনি সেই দৃশ্যের সব কটি জিনিষ খুব ভাল করে দেখতে পারছেন, তাঁর চেয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় কম তীক্ষ্ণ। হয়ত তাঁর চেয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় অনেক বেশি তীক্ষ্ণ, অনেক বেশি শক্তিশালী, তবুও তাঁর চেয়ে সেই দৃশ্য থেকে আহরণ করার ক্ষমতা আমাদের কম। তার কারণ আমরা সেই বিশেষ দৃশ্যপটে আমাদের ইন্দ্রিয় ব্যবহার করতে শিখিনি, আর তিনি শিখেছেন।

মাইজনিয়ে : ১৮১৪ (নেপোলিয়ন এবং তাঁর জেনরলবৃন্দ ও সৈন্যবাহিনী)

'ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার' শব্দটিতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে দেখা বা শোনা একটি সকর্মক ক্রিয়া, মোটেই অকর্মক নয়; অর্থাৎ দেখা বা শোনা কোনটাই আপনাআপনি হয় না। যখন জাহাজের যন্ত্রপাতির মোটামুটি উদ্দেশ্য এবং ব্যবস্থাটা বুঝি তখন খুঁটিনাটি কলকব্জার দিকে দৃষ্টি যায়, যা নাকি আগে চোখে পড়ত না। যখন বিদেশী ভাষার কিছু কিছু শব্দ আয়ত্ত করি, যখন শুনতে শিখি, তখন তার নানা রকম সূক্ষ্ম আওয়াজ, মানে, কানে ধরা পড়ে। অভিজ্ঞতার বলে আমাদের যে শিক্ষা হয় তারই কৃপায় আমরা জাহাজের যন্ত্রপাতি চিনি, বিদেশী ভাষা বুঝি।

প্রতিমুহূর্তে যে অবিচ্ছিন্ন স্রোত চলেছে তার সামান্য দু'একটি বিষয়ের উল্লেখমাত্র করলুম। যতদিন আমরা প্রকৃতপক্ষে সজীব থাকি ততদিন ক্রমাগতই আমাদের অভিজ্ঞতার পরিধি বেড়ে চলে, সেই অভিজ্ঞতার উপযুক্ত ব্যবহারে আমরাও বেড়ে চলি; ক্রমশই প্রতিটি জিনিষ আরও স্পষ্টভাবে, তীক্ষ্ণভাবে দেখতে, বিচার করতে শিখি; প্রতিটি জিনিষে আমরা ক্রমশ অনেক বেশি অর্থ খুঁজে পাই। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটে, সে টেনিস খেলা, মোটর চালানো, ডাক্তারি করা বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা, যাই হোক। নানা রকম অর্থের শৃঙ্খলায় পরিপুষ্ট হয়ে আমাদের মন গড়ে ওঠে, বাড়ে; আমাদের অনুভূতির মূলধন বাড়ে, সেগুলি অনেক বেশি প্রশস্ত, ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়। অর্থাৎ, সোজা কথায় দাঁড়ায় এই যে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি অন্যোন্য-নির্ভর; একটি ছাড়া অন্যটি কাজ করে না; দুটি পরস্পরের উপর সর্বদা কাজ করে বলেই মানুষের প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বিবেচনা, বিচার বাড়ে।

আমরা যদি এই সাধারণ সূত্রটি মনে রাখি তাহলে শিল্প বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা কেন প্রয়োজন তা বুঝতে পারব। তার কারণ আমরা যা দেখতে শিখি তাই দেখি, অনুভব করি, সে বাস্তব জীবনেই হোক, আর শিল্পকলাতেই হোক। রঙে, কথায়, বা সঙ্গীতে শিল্পী তাঁর অভিজ্ঞতাকে রূপ দেন, শরীর দেন; সুতরাং তাঁর ছবি, কাব্য বা সঙ্গীত বুঝতে গেলে আমাদের নিজেদের সাধ্যমত তাঁর অভিজ্ঞতাকে ফিরেফিরতি গড়তে হয়। শিল্পীর অভিজ্ঞতা আর তাঁর শ্রোতা বা দর্শকের অভিজ্ঞতার মধ্যে মূলগত তফাৎ কিছু নেই, যদিও দুজনের ক্ষমতার আকাশ-পাতাল তফাৎ থাকতে পারে। শিল্পীর অভিজ্ঞতা আসে তাঁর বিশেষ পটভূমি থেকে, তাঁর নিজস্ব প্রিয় বিষয় থেকে, তাঁর অনুভব করবার বিশেষ অভ্যাস-সমষ্টি থেকে। মূলত কিন্তু তাদের মিল আছে বৈজ্ঞানিকের চিন্তার অভ্যাসধারার সঙ্গে। সুতরাং দুই ক্ষেত্রেই, অর্থাৎ শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিকের উভয়ের অভিজ্ঞতায়, তৃতীয় ব্যক্তির ভাগ বসানোর সম্ভাবনা সর্বদাই খোলা থাকে। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি তখনই

ভাগ বসাতে পারেন, ভাগ বসানর যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন, যখন তিনি শিল্পীর পটভূমির সমতুল্য পটভূমি, তাঁর অভ্যাসের সমতুল্য অভ্যাস আয়ত্ত করার কষ্ট স্বীকার করতে রাজী থাকেন। শিল্পী যেমনভাবে দেখেন তেমন ভাবে দেখতে শেখা খুবই দুরূহ ব্যাপার; সে শিক্ষায় কোন মুষ্টিযোগ বা শর্ট-কাটের অবকাশ নেই; তাতে কোন মন্ত্রতন্ত্র বা টোটকা-বাজি চলে না। তাতে আমাদের সমস্ত উদ্যম, সমস্ত শক্তি ব্যয় করতে হয়। শুধু তাই নয়, আমাদের যত কিছু শক্তি তার অনুশীলন করে তাকে উপযুক্ত ব্যবস্থামত নিযুক্ত করতে হয়; তার জন্যে দরকার হয় শিল্পের অর্থ সম্পর্কে, মানব-প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের কি সম্বন্ধ, সে বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত বোধ। বৈজ্ঞানিক যেমন তাঁর অঙ্ক এবং যন্ত্রপাতি দিয়ে আমাদের চোখের সমুখে বিশ্বের স্বরূপ উন্মোচন করতে চান, শিল্পীও ঠিক তেমনি তাঁর নিজস্ব যন্ত্রপাতির সাহায্যে বাহ্য-জগৎকে আলোকিত করতে চান। পদার্থ বা রসায়ন বিদ্যাকে আমরা কখনও যেমন নিজের মনগড়া জগৎ বলে মনে করি না তেমনি শিল্পকেও ছেলেখেলা ভাবার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে; শিল্প মনগড়া জগৎ বা খেয়ালখুসীর ব্যাপার এ কল্পনা একেবারে বর্জন করতে হবে। বিজ্ঞানের মত শিল্পেও অনুশীলন, শিক্ষা, অনুসন্ধানের বিশিষ্ট ধারার একান্ত প্রয়োজন আছে, সেখানেও অত্যন্ত যত্নসহকারে দেখতে শিখতে হয়, তা না হলে সব বৃথা হয়। অর্থাৎ বিশ্বজগতের কোন্ কোন্ অভিব্যক্তি সম্বন্ধে শিল্পীর উৎসাহ থাকা সম্ভব, তিনি কি কি উপায়ে সেই সব অভিব্যক্তিকে রূপ দিতে পারেন, নিজের কাজে কি ভাবে সব উপাদানগুলি তিনি গোছান, কি উপায় অবলম্বন করেন, কি উপায়ে সাফল্য আসে, সে-সম্বন্ধে জানা দরকার, তবেই চিত্রকলা বা অন্য কোন শিল্পকলা ঠিকমত বোঝা যায়, শিল্পরসের সন্ধান পাওয়া যায়।

এই প্রবন্ধটি 'ছবি কাকে বলে' নামক ভবিষ্যৎ বইয়ের প্রথম অধ্যায়। বইটি লেখার বিষয় আমি আলফ্রেড বার্নসের 'দি আর্ট ইন্ পেণ্টিং' বইটির কাছে বিশেষভাবে ঋণী। অনেকাংশেই বার্নসের মর্মানুবাদ।—লেখক

মাজাচ্চো : ধার্য কর দান।

নীল আকাশ—
অদ্ভুত এই সূর্যের আলো।
বসন্তের আমেজ কী অপূর্ব!

বাগিচার কোণ।
গাছের ডালগুলোয়
বুলিয়েছে সবুজের তুলি।

ছবি, নিখুঁত একখানি ছবি।

কিন্তু বস্‌ফরাসের মাছ—
সুন্দর, আরো সুন্দর!

ভাজলে, তার আঘ্রাণ ক্ষুধার্তের নাকে
গোলাপের গন্ধকে সুনিশ্চিত হার মানায় যে!

একটি তুর্কী কবিতার অনুসরণে

ইমহফ্ ও সল্‌ভিন্সের শিল্পসাধনা

সল্‌ভিন্স অঙ্কিত সংকীর্তনের চিত্র।

বিনয় ঘোষ

মোগল বাদশাহের আমল থেকেই ভারতবর্ষের বিচিত্র সম্পদের কথা ইয়োরোপে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। ইয়োরোপও তখন মধ্যযুগের ইয়োরোপ ছিল না। রিনেইস্যান্সের ভাবাদর্শ তখন ইটালির নগরসীমানা ছাড়িয়ে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে বিস্তারলাভ করছিল। শিল্পকলার প্রত্যেক ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের নতুন আকরের সন্ধানে শিল্পীদের দুঃসাহসিক অভিযানের অন্ত ছিল না। নতুন যুগের বণিকরা যেমন বিত্তের লোভে, সোনাদানার সন্ধানে, অজানা সব দেশের দিকে সাগরপাড়ি দিয়েছিলেন, জ্ঞানবিদ্যার সাধকরাও তেমনি পরিব্রাজকের মতন বেরিয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীর পথে। মোগল দরবারে ইয়োরোপের

সল্‌ভিন্স অঙ্কিত গণৎকারের চিত্র

যে পর্যটকরা এসেছিলেন, তাঁরা দেশে ফিরে গিয়ে ভারতবর্ষের যে কাহিনী বললেন, তা রূপকথার মতন আকর্ষণীয়। শিল্পীদের কাছে তার আকর্ষণ ছিল আরও বেশি। কিন্তু এদেশে আসা সকলের পক্ষে তখন সহজ ছিল না, শিল্পীদের পক্ষে তো একেবারেই ছিল না। শিল্পীরা তখন রাজসভার পোষকতা ছেড়ে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করতে পারেন নি। ক্যাথলিক বা প্রটেস্ট্যান্ট, কোন দেশের শিল্পীরাই তখন ধনিক-নুখাপেক্ষিতা একেবারে বর্জন করতে পারেন নি, করবার চেষ্টা করছিলেন মাত্র। সুতরাং ভৌগোলিক ব্যবধানের অন্তরায় ছাড়াও, শিল্পীদের পক্ষে তখন বিদেশের অপরিচিত পরিবেশে অভিযান করার আরও অনেক বাধা ছিল। সবচেয়ে বড় বাধা, পোষকতার সমস্যা, অর্থাৎ জীবিকার সমস্যা। স্বদেশেই সবসময় পেট্রন পাওয়া যেত না। যাও বা দু-চারজন পাওয়া যেত, তাও প্রখ্যাতরা কুক্ষিগত করে রেখে দিতেন। সাধারণ বা মধ্যস্তরের শিল্পীদের পক্ষে শিল্পচর্চা করে বাঁচাই কঠিন ছিল। এই অবস্থায় বিদেশযাত্রা করা শিল্পীদের কাছে স্বপ্ন বলেই মনে হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাই শিল্পীরা আমাদের দেশে আসবার সুযোগ পাননি তেমন। পলাশীর যুদ্ধের পর দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া যখন বদলে গেল, ইংরেজরা যখন রাজদণ্ড ধারণ করবার অধিকার পেলেন, তখন কেবল বৃটিশ শিল্পীরা নন, ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের শিল্পীরাও এদেশে আসবার খানিকটা সুযোগ পেলেন। কিন্তু স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চা করে শিল্পীদের নিজস্ব বাসনা চরিতার্থ করবার মতন সামাজিক পরিবেশ তখনও তৈরি হয়নি। প্রধানত শিল্পীরা তখন সামরিক বিভাগে কোন কাজ-কর্ম নিয়ে এদেশে আসতেন। আসবার পর পেট্রন খুঁজে বেড়াতে হত তাঁদের। বিংশ শতাব্দীতেও যখন অধিকাংশ শিল্পীদের মুষ্টিমেয় কোন পেট্রনগোষ্ঠির উপর নির্ভর করতে হয়, তখন দু-শ বছর আগে, সপ্তদশ শতাব্দীতে সেই নির্ভরতা যে আরও কত বেশি ছিল এবং পেট্রনগোষ্ঠি যে আরও কত সঙ্কীর্ণ ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। হেষ্টিংস ও কর্ণওয়ালিসের আমলে অনেক ইয়োরোপীয় শিল্পী এদেশে এসে-ছিলেন এবং প্রথমেই তাঁদের পৃষ্ঠপোষক খুঁজতে হয়েছিল। উঁচুস্তরের শিল্পী যাঁরা তাঁদের দেশ ছেড়ে বিদেশে যাবার প্রয়োজন বা অবকাশ হয়নি। তাঁরা বিশেষ কেউ আসেননওনি এদেশে। মধ্যস্তরের শক্তি-মান শিল্পী অনেক এসেছেন, এবং সাধারণ স্তরের শিল্পী তার চেয়ে আরও অনেক বেশি। ভারতবর্ষে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশের কলকাতা শহরে একবার অন্তত আসেননি, এরকম শিল্পী খুব অল্পই ছিলেন। কলকাতা তখন নতুন শাসনকেন্দ্র ও আকর্ষণ-কেন্দ্র। কলকাতা শহরে না এলে, ভারতবর্ষে আসা সার্থক হত না বলে তাঁরা মনে করতেন।

নানারকমের শিল্পী এসেছিলেন কলকাতায়। তখন পোর্ট্রেট অঙ্কন, এনগ্রেভিং, প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রণ, পশুপক্ষী চিত্রণ ইত্যাদির রেওয়াজ ছিল খুব। অধিকাংশ শিল্পীকে সবরকম পদ্ধতিই আয়ত্ত করতে হত। কেউ কেউ বিশেষ একটি পদ্ধতিতে কুশলতা অর্জন করতেন। কলকাতা শহরে এসে কিভাবে

তাঁরা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজেদের কথা শহর-বাসীদের জানাতেন, তার কয়েকটি নিদর্শন আগে দিয়েছি।[১] কতরকমের শিল্পী এই শহরে আসতেন তার আভাস দেবার জন্য আরও কয়েকটি বিজ্ঞপ্তির উল্লেখ করছি এখানে :

Calcutta Gazette
The 26th March 1789

Samuel Gold, Horse and Dog Painter, No. 438, Lall Bazar,

Hopes that by an assiduous intention to his business he will merit encouragement, and flatters himself his abilities are equal to his undertaking in the above particular study, it having been under those great masters, Messrs. Stubbs, Gilpin, and Barrett in Europe.

১ গত মাসের "সুন্দরম্" দ্রষ্টব্য

ষ্টাব্‌স, গিল্‌পিন, ব্যারেট প্রমুখ ইয়োরোপের বিখ্যাত পশুচিত্র-শিল্পীরা লালবাজারের চিত্রকর স্যামুয়েল গোল্ডের গুরু ছিলেন। তিনি তাঁর কাজ ভালই জানেন। ঘোড়া ও কুকুরের ছবি আঁকতে তিনি খুবই দক্ষ। কলকাতা শহরে তখন ঘোড়া ও কুকুর দুয়েরই যথেষ্ট প্রাচুর্য ছিল। পেইন্টিং ব্যাপারটা গোল্ড সাহেবের 'বিজনেস' এবং তার প্রতি তিনি 'অ্যাসিডুয়াস ইন্টেনশন' প্রয়োগ করেন বলেই তিনি কলকাতাবাসীর পোষকতা দাবি করেছেন।

Calcutta Gazette
The 13th October 1791

Miniature and Crayon Painting, by F. Dean,

Who begs leave to inform those gentle-men and ladies of Calcutta that wish to have their likeness in either of those branches,

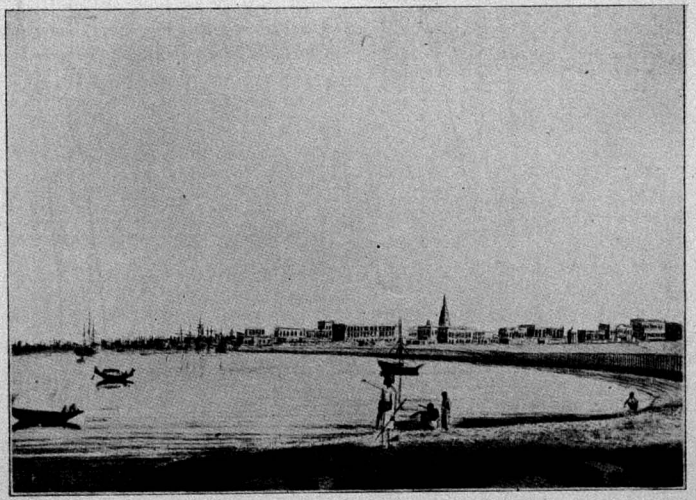

এসপ্ল্যানেডের দৃশ্য—১৭৯৪। উইলিয়াম বেইলি।

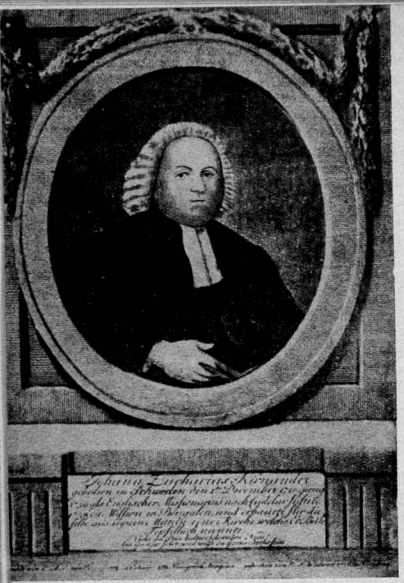

ইমহফ অঙ্কিত কিয়ারন্যাণ্ডারের চিত্র

that he is just arrived on the 'Hunter' and is now ready to wait on them at their house, if most agreeable. His terms are moderate and a likeness may be depended on.

A line directed to him at his house in the street opposite to Lee and Kennedy's, from which it is the fourth or fifth house on the right hand, where the greatest attention will be paid.

ডীন সাহেব তাঁর গুরুদের কথা গর্ব করে বলেননি। কেবল এই কথা জানিয়েছেন যে 'হান্টার' জাহাজে করে সবেমাত্র কলকাতায় পৌঁছেচেন। 'মিনিয়েচার' ও 'ক্রেয়ন' চিত্রণে তিনি কুশলী, পারিশ্রমিকও তাঁর খুব বেশি নয়। খবর দিলে তিনি বাড়িতে গিয়ে পোর্ট্রেট এঁকে দিতে রাজী আছেন। তবে তাঁর বিজ্ঞপ্তি দেখে মনে হয় যে খবর দেওয়া তাঁকে খুব মুশকিল। লী ও কেনেডির বাড়ির উল্টোদিকের রাস্তায়, ডানদিকে চতুর্থ বা পঞ্চম বাড়ি হল ডীন সাহেবের। রাস্তাঘাটের সব নামকরণ বা নম্বর তখনও হয়নি। না হলেও, তখনকার কলকাতার বাহ্যরূপ যা ছিল, তাতে এরকম নির্দেশ পেলেও বাড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল না।

শিল্পী ডীন সাহেবের মজুরি 'মডারেট' বলে বিজ্ঞাপিত হলেও, তখনকার দিনের পোর্ট্রেট-শিল্পী বা এনগ্রেভারদের মজুরি খুব বেশি ছিল। সাধারণ গৃহস্থ বা মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে শিল্পীদের দিয়ে পোর্ট্রেট আঁকানো বা অন্য কোন কাজ করানো একেবারেই সম্ভব ছিল না। সাধারণ লোকের শিল্পকলা-বোধও অবশ্য তখন বিশেষ জাগেনি। ধনিক ও অভিজাতদের পোষকতার উপরেই শিল্পীদের বেশি নির্ভর করতে হত অর্থাৎ কমিশন ও ক্যাশ ট্র্যানজ্যাকশনের উপর। পোর্ট্রেট-চিত্রের যে খুব বেশি প্রচলন হয়েছিল, তার একটা অন্যতম কারণও হল এই ধনিকপোষকতা। বণিকতন্ত্রের আদিপর্বের ধনিকরা ও গোত্রান্তরিত অভিজাতরা নিজেদের পোর্ট্রেটের মধ্যে অহমিকাস্ফীত আত্মাকৃতি দেখে মনে মনে তৃপ্তি পেতেন। ক্ষমতাশালী শিল্পীরা এইভাবে কমিশনে পোর্ট্রেট আঁকতে আঁকতে কিরকম বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং নিজেদের প্রতিভার অপচয় করেছিলেন, তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায় প্রখ্যাত শিল্পী গেন্‌সবোরোর একখানি চিঠি থেকে। চিঠিখানি এই[১]:

> I'm sick of Portraits, and wish very much to take my viol-da-gam and walk off to some sweet village, where I can paint landskips and enjoy the fag end of life in quietness and ease. But these fine ladies and their tea drinkings, dancings and husband-huntings, etc. etc., will fob me out of the last ten years . . .

গেন্‌সবোরো ও রেনল্ডসের যুগের কলকাতার বিদেশী শিল্পীদের অবস্থাও কতকটা এইরকম হয়েছিল। কলকাতার ধনিকসমাজ ও সাহেবসমাজ তখন নাচ-গান-হল্লা, ভোজসভা, বিজয়োৎসব ও শ্বেতাশ্বোৎসব নিয়ে মশগুল থাকতেন, কথায় কথায় চ্যালেঞ্জ করে ডুয়েল লড়তেন, ট্যাভার্ণ, কফিহাউস ও বাগান-বাড়িতে ফূর্তি করতেন। নয়াশহর কলকাতায় বিদেশিনী যাঁরা আসতেন তাঁদেরও 'হাজব্যান্ড-হান্টিং'

১। হারবার্ট রীডের The Meaning of Art বইয়ে উদ্ধৃত ১১৭ পৃষ্ঠা।

বা পতিশিকার একটা অন্যতম নেশা ছিল। এই অবস্থায়, এই শ্রেণীর পেট্রননির্ভর সমাজে, পোর্ট্রেট ও ল্যাণ্ডস্কেপ ছাড়া অন্য কোন ধরনের শিল্পচর্চার সুযোগ বিশেষ ছিল না। কলকাতায় এসে বিদেশী শিল্পীরা অধিকাংশই তাই করতে বাধ্য হয়েছেন।

স্বভাবতঃই পোর্ট্রেট-চিত্রণের মজুরির হারও খুব বেশি ছিল। ১৭৯৮ সালের ৫ এপ্রিল, পোর্ট্রেট-চিত্রকর মরিস সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাচ্ছেন যে তিনি গবর্ণর-হাউসের পিছনে ছইলার প্লেসে বাসা করেছেন এবং তাঁর পোর্ট্রেট আঁকার 'রেট' হল এই :

হেড্ সাইজ	—১৫ স্বর্ণমোহর
থ্রি-কোয়ার্টার	—২০ স্বর্ণমোহর
কিট্‌ক্যাট	—২৫ স্বর্ণমোহর
হাফ সাইজ	—৪০ স্বর্ণমোহর
ফুল সাইজ	—৮০ স্বর্ণমোহর

আশী বা চল্লিশ মোহর দিয়ে পোর্ট্রেট আঁকানোর ক্ষমতা কলকাতা শহরে তখন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ছিল। এদেশী রাজরাজড়া বা ধনিক বেনিয়ান এবং বড় বড় কয়েকজন সাহেবসুবো ছাড়া পোর্ট্রেট আঁকানোর সাধ্য ছিল না কারও। সাধ্য যাঁদের ছিল, তাঁদের সকলের সাধ ছিল বলেও মনে হয় না। শিল্পীদের তাই গভীর সমস্যার সম্মুখীন হতে হত। হাতে-গোণা কয়েকজন মাত্র পেট্রনের উপর বহু শিল্পীকে নির্ভর করতে হত। কেবল পোর্ট্রেট নয়, সবরকমের চিত্রেরই তাই দাম ছিল খুব বেশী। বেইলি সাহেব যখন কলকাতা শহরের কয়েকটি নির্বাচিত বহির্দৃশ্য তাম্রপটে খোদাই করে প্রিন্ট করেছিলেন (১৭৯৪), তখন প্রত্যেকটি ১৫। ১১ ইঞ্চির প্রিন্টের জন্য তিনি মূল্য ধার্য করেছিলেন পঁচিশ টাকা করে। তখনকার টাকার বাজারে পঁচিশ টাকার 'মূল্য' ছিল যথেষ্ট এবং

সল্‌ভিন্স অঙ্কিত স্ট্যুয়ার্ট কোম্পানী ও তার সামনের রাস্তার দৃশ্য।

সাধারণ লোকের পক্ষে তাই দিয়ে তামা-খোদাই একটি প্রিণ্ট কেনা কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল।

এবারে কয়েকজন খ্যাতনামা বিদেশী শিল্পীর কথা আলোচনা করা যাক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-দিকে অনেক বিখ্যাত শিল্পী কলকাতা শহরে এসে-ছিলেন। ইমহফ, উইলিয়ম হজেস, ড্যানিয়েল খুড়ো-ভাইপোরা, জোফানি, সল্‌ভিন্স, রবার্ট হোম এবং আরও অনেকে। এঁরা সকলেই যে ব্রিটিশ শিল্পী, তা নন। ইয়োরোপের প্রায় সব দেশের শিল্পীরা এসেছিলেন এবং চিত্রাঙ্কনে তাঁদের নিজস্ব বিশিষ্ট ধারার বিচিত্র মিলন ঘটিয়েছিলেন কলকাতা শহরে। এবারে দুজন শিল্পীর কথা বলব, একজনের নাম কার্ল ভন্ ইমহফ, আর একজনের নাম ফ্রান্জ বল্টাসার সলভিন্স। দু-জনের কেউ বৃটিশ শিল্পী নন। ইমহফ জার্মান, সলভিন্স বেলজিয়ান। ইমহফ খুব উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন না, সাধারণ স্তরের শিল্পী ছিলেন। সলভিন্স শিল্পী হিসেবে যাই হন না কেন, এদেশে এসে তিনি যে কাজ করে গেছেন, তাঁর জন্য তাঁর নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়।

ক্রাইষ্টফ্ অ্যাডাম কার্ল ভন ইমহফ হলেন প্রাচীন বনেদী জার্মান বেরন পরিবারের সন্তান। শিল্প-চর্চা করবার মতন প্রচুর অর্থ ও অবসর, দুইই তাঁর ছিল। সামরিক বিভাগে কাজ করতেন তিনি এবং এবং অবসর পেলে ছবি আঁকতেন, বেশির ভাগই পোর্ট্রেট। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ফরাসী মহিলা, নাম অ্যানা মারিয়া অ্যাপোলোনিয়া। সমরবিভাগের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর কিছুকাল ইমহফ বেকার থাকেন। ১৭৬৩-৬৪ সালের কথা। এই সময় জার্মানি ছেড়ে তিনি ইংলণ্ডে যান, মিনিয়েচার চিত্রশিল্পী হিসেবে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের জন্য। সেখানে গিয়ে ইংলণ্ডের রাজপরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ পান এবং মহারানীর একটি মিনিয়েচার পোর্ট্রেট আঁকেন। ১৭৬৮ সালে এই চিত্রটি আর্টিস্টদের সোসাইটিতে প্রদর্শিত হয়। রাজকীয় পোষকতা লাভ করেও, তাঁর পক্ষে স্বাধীনভাবে ছবি এঁকে জীবন-ধারণ করা ক্রমে বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে। এর মধ্যে কয়েকটি সন্তানও তাঁর হয়। লণ্ডনে ছবি এঁকে আর দিন চলে না, এমন অবস্থা হল। ভারতবর্ষ তখন ওদেশের মানুষের কাছে স্বপ্নময় স্বর্ণপুরীর মতন লোভনীয়। স্বদেশে যার কিছু হয় না, হবার কোন আশাও থাকে না, সেও স্বপ্ন দেখে যে ভারতবর্ষে গিয়ে কিছু একটা হতে পারবে। ইমহফও তাই ভাবলেন। কিন্তু যাবার উপায় কি? একমাত্র উপায়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কোন কাজ জোটানো। আগে তিনি জার্মানিতে সমরবিভাগে কাজ করেছেন। সুতরাং কাজ পাওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হল না। মাদ্রাজ সেনাবাহিনীতে ক্যাডেটের চাকরি পেলেন ইমহফ। স্ত্রী ও একটিপুত্রসহ ভারতবর্ষে যাবার অনুমতিও পেলেন। ১৭৬৯সালের মার্চ মাসে যাত্রা করে মাদ্রাজে পৌঁছলেন সেপ্টেম্বরে।

মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর, মাত্র ছ'মাস। কিন্তু এই ছ'মাসের মধ্যে সমুদ্রপথে এমন একটি ব্যাপার ঘটে গেল, যা ইমহফের শিল্পজীবনের পরমকাম্য নির্মেঘ দিনগুলিকে মেঘলা করে দিল। ভারতের পথে যে এমন কাঁটা বিঁধবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। 'ডিউক অব গ্র্যাফটন' জাহাজে করে ইমহফ-দম্পতী মাদ্রাজ আসছিলেন। জাহাজে তাঁদের একজন সহযাত্রী ছিলেন, যিনি পরে তাঁদের পরম বন্ধু হয়েছিলেন। তাঁর নাম ওয়ারেন হেস্টিংস। একই জাহাজে হেস্টিংস আসছিলেন, মাদ্রাজ কৌন্সিলের সদস্যপদে নিযুক্ত হয়ে। জাহাজে ইমহফ-দম্পতীর সঙ্গে হেস্টিংসের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হল, এবং ছ'মাসের মধ্যে সমুদ্রপথে তাঁর সেই বন্ধুত্ব গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠল, বিশেষ করে শ্রীমতী ইমহফের সঙ্গে।

তিনজনেই একসঙ্গে মাদ্রাজে এসে পৌঁছলেন। ইমহফ-দম্পতী হেস্টিংসের 'অতিথি' হয়ে মাদ্রাজে রই-লেন। মাদ্রাজ ফোর্টের মধ্যে হেস্টিংসের সঙ্গে নিশ্চয় একত্রে বাস করেননি, পৃথকভাবেই ছিলেন, তাঁর তত্ত্বাবধানে। নতুন কৌন্সিল-সদস্যের অতিথিদের খাতির করে চলতেন সকলে। জার্মান বেরন শিল্পী হলেও খুব বুদ্ধিমান ছিলেন বলে মনে হয় না। হেস্টিং-সের পরিচয়পত্র নিয়ে তিনি হোমরা-চোমরাদের পোর্ট্রেট এঁকে বেড়াতে লাগলেন মনের আনন্দে। বেশ কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তিও ঘটতে লাগল। ওদিকে যা হবার তা হয়ে গেল ক্রমে। হেস্টিংস ও শ্রীমতী ইমহফ পারস্পরিক টানে বহুদূর পর্যন্ত তলিয়ে গেলেন। সাহেব-সমাজে রটে গেল যে যথাশীঘ্র ইমহফ-দম্পতীর মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ হবে এবং অ্যাপোলোনিয়া হবেন মিসেস হেস্টিংস।

ইমহফের বেতন ছিল দৈনিক এক টাকা আন্দাজ। তার উপর হয়ত কিছু ভাতা বাবদ পেতেন। তা দিয়ে পুত্রসহ স্ত্রী প্রতিপালন করা তখনকার দিনে সাহেবসমাজে সম্ভব ছিল না। উপরি পয়সা তিনি পোর্ট্রেট এঁকে রোজগার করতেন। কিন্তু তাতেও তাঁর দক্ষতা বেশি ছিল না। ক্রমে তাঁর আয় কমতে লাগল। ওদিকেও হেস্টিংসের প্রতি শ্রীমতীর টান বাড়তে লাগল। দাম্পত্য-জীবন এমন হয়ে উঠল যে পোর্ট্রেট আঁকার উৎসাহও আর রইল না। ইমহফ স্থির করলেন, মাদ্রাজ ছেড়ে বাংলাদেশে আসবেন। ক্যাডেটের পদত্যাগ করে তিনি ১৭৭০ সালের শেষ-দিকে কলকাতা শহরে এলেন। একাই এলেন, তাঁর স্ত্রী এলেন না। হেস্টিংস চিঠি লিখে দিলেন তাঁর কলকাতার বন্ধুদের কাছে, ইমহফকে যথাসাধ্য ছবি আঁকার কাজ দিয়ে সাহায্য করবার জন্য।[১] সাহায্য তাঁরা করতে লাগলেন। চিঠির পর চিঠি লিখে এইবার ইমহফ চেষ্টা করলেন স্ত্রীকে কলকাতায় নিয়ে আসবার জন্য। ১৭৭১ সালের অক্টোবরে শ্রীমতী ইমহফ কলকাতায় এলেন। কিন্তু জার্মান বেরন নিশ্চিন্তে ছবি আঁকার সৌভাগ্য নিয়ে জন্মাননি মনে হয়। অল্পদিনের মধ্যেই হেস্টিংস কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের গবর্ণর নিযুক্ত হলেন এবং ১৭৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ইমহফের মতন যাঁরা যে-কোন একটা চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে এসে অন্য ধান্ধায় ঘুরে বেড়ান, তাঁদের উপর কোম্পানীর কর্তারা ক্রুদ্ধ হয়ে অবিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ করলেন। ইমহফও সেই আদেশ পেয়ে চিন্তিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু আদেশ অমান্য করার উপায় নেই। ইমহফ তাঁর পুত্রটিকে প্রথম পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে কিছুদিন পরে, ১৭৭৩ সালের মার্চ মাসে রওয়ানা হয়ে সেপ্টেম্বরে ইংলণ্ড পৌঁছলেন। শ্রীমতী ইমহফ কলকাতাতেই রইলেন। ১৭৭৭ সালে যখন আইনসম্মত বিবাহবিচ্ছেদের সংবাদ কলকাতায় পৌঁছল, তখন হেস্টিংস বিবাহ করলেন শ্রীমতী ইমহফকে। জার্মান বেরন পোর্ট্রেট চিত্র-করের পত্নী ভারতের প্রথম বড়লাটের পত্নী হলেন, শিল্পী ইমহফ অনেক আশাভরসা নিয়ে ছবি আঁকতে এসেছিলেন কলকাতা শহরে। হেস্টিংসের মতন একজন জাঁদরেল পেট্রনও পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে সর্বহারা হয়ে ফিরে যেতে হল।

মাদ্রাজে ও কলকাতায় ইমহফ যে ছবিগুলি এঁকেছিলেন, তার অধিকাংশই এখন নষ্ট হয়ে গেছে। হেস্টিংসের পোর্ট্রেট তিনি একাধিক এঁকেছিলেন, তার কোনটাই এখন পাওয়া যায় না। একখানি তাঁর আঁকা ছবি পাওয়া যায় আজও। ছবিখানি হল, কলকাতার 'ওল্ড মিশন চার্চের' প্রতিষ্ঠাতা পাদ্রি জন জ্যাকেরিয়া কীয়েরন্যান্ডারের। ১৭৭৩ সালে ইমহফ ছবিখানি এঁকেছিলেন।

বল্ট সল্‌ভিন্স ১৭৬০ সালে আন্তওয়ার্পে জন্মে-ছিলেন। তিনি নৌচিত্রকলায় অল্পবয়সে বিশেষ কুশলতা অর্জন করার জন্য অনেকবার অ্যাকাডেমি-পুরস্কার পেয়েছিলেন। দেশের রাজনৈতিক গোল-যোগের সময় তিনি দেশত্যাগ করে বাইরে চলে যান এবং নানাস্থান ঘুরে ১৭৯১ সালে ভারতবর্ষে আসেন। সলভিন্সের খবর প্রথম আমরা পাই 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকার (২৬ এপ্রিল ১৭৯২) একটি সংবাদ থেকে। টিপু সুলতানকে পরাজিত করে কর্ণওয়ালিস বিজয়োৎ-সবের আয়োজন করেছিলেন কলকাতা শহরে। গবর্ণ-মেন্ট হাউস আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল এবং যুদ্ধের বিজয়দৃশ্যের একটি ছবি এই উপলক্ষে সলভিন্স এঁকে-ছিলেন। পরের বছর, ১৭৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, প্রথম বার্ষিক বিজয়োৎসবের সময়, সলভিন্স আবার নতুন করে একটি ছবি আঁকেন। এই বছরের ৭ই ফেব্রুয়ারী 'ক্যালকাটা গেজেট' থেকে জানা যায় যে সলভিন্স যুদ্ধের অনেকগুলি চিত্র উৎসব উপলক্ষে এঁকে-ছিলেন। কলকাতার সর্বোচ্চ সাহেবসমাজের সঙ্গে যে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ও পরিচয় ছিল, তা এই সব খবর থেকেই বোঝা যায়। জার্মান শিল্পী ইমহফ যেকারণে হেস্টিংসের পোষকতালাভে সমর্থ হয়েছিলেন, সলভিন্স সেরকম কোন কারণে কর্ণওয়ালিসের পোষকতা পাননি। খানিকটা নিজগুণেই তিনি প্রতিষ্ঠা পেয়ে-ছিলেন। কিন্তু তা পেয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি পসার জমাতে পারেননি। তার প্রধান কারণ, তখনকার দিনে সবচেয়ে সহজে অর্থলাভের উপায় ছিল পোর্ট্রেট

১ হেস্টিংসের চিঠিগুলি Dodwell-এর Nabobs of Madras গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

ওরা ছবি আঁকে—
ক্যানভাস, কাগজ, রং, তুলি,
কত হাঙ্গামা।

আমি চুপটি করে এই জানলার ধারে বসে
মনে মনে কত না ছবি আঁকি—
মিলন, বিরহ, বেদনার কত না ছবি!

ওদের সঙ্গে আমার তফাত,
ওরা আঁকে, বিক্রি করে—
আমার ছবি বিকোয় না কোথাও।
আমি যে কেবল আঁকি আর মুছি,
মুছি আর আঁকি।

আমার নিত্যকার এই খেলা—
সবার অগোচরে চলেছে নিত্যকাল।
—আমি কি শিল্পী নই?

একটি মিশরীয় কবিতার অনুসরণে

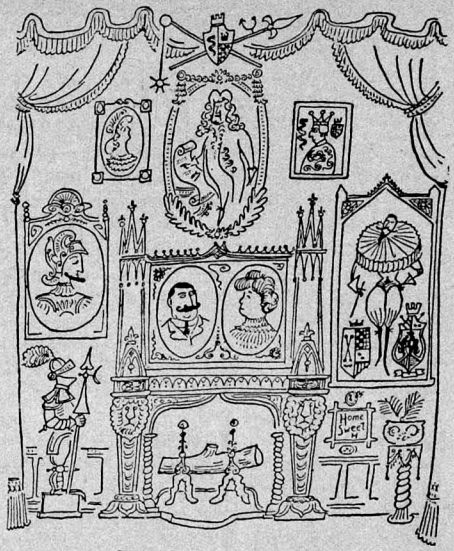

ডুভিন

আশু চট্টোপাধ্যায়

কোনো ছবি নিয়ে দর কষাকষি ডুভিন একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তাহলে তাঁর মেজাজ বিগড়ে যেত, ফিরে এসে বিছানার আশ্রয় নিতেন। তিনি নিজে যখন কিছু কিনতেন, দিতেন সব চেয়ে বেশি দাম, প্রায় কল্পনাতীত মূল্য। টাকার বাজার যখন মন্দা, ডুভিন কি করে টাকার হরির লুট দিতেন তার রহস্য কেউ উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। ডুভিন যে ছবি কিনতেন, তা র‍্যাফেল বা টিসিয়ান বা যাঁরই আঁকা হোক না কেন, তাতেই তাঁর ছাপ পড়ে গেল। সেই নামের মর্যাদা অনুযায়ী মূল্য হওয়া চাই, নইলে ডুভিনের মান যায়। একবার এক ইংরেজ ভদ্রমহিলার একটি পারিবারিক ছবি ডুভিন কিনতে চাইলেন। ভদ্রমহিলা ভয়ে ভয়ে সসঙ্কোচে দাম চাইলেন আঠারো হাজার পাউণ্ড। "কি বললেন?" ডুভিন প্রায় ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করে উঠলেন, "এই চমৎকার ছবিটির দাম ষোটে আঠারো হাজার পাউণ্ড! কি লজ্জার কথা!" তারপর ডুভিন ছবিটির গুণকীর্তন সুরু করলেন, যেন তিনিই ছবিটি বিক্রী করছেন। কিন্তু ততক্ষণে তিনি মনে মনে হিসেব করে নিয়েছেন কি দামে তিনি সেটি এক ধনী অ্যামেরিকান মক্কেলকে বিক্রী করবেন। তারপর এক অদ্ভুত বিপরীত দরদস্তুর আরম্ভ হল। বিক্রেতা দর কমিয়ে রাখতে চান, হয়ত ধর্মজ্ঞানে নয়ত ভয়ে, আর ক্রেতা ডুভিন তা বাড়াতে চান। শেষকালে ডুভিন জানিয়ে দিলেন যে পঁচিশ হাজার পাউণ্ডের কমে তিনি ও ছবি কিছুতেই কিনতে পারেন না, তাতে ছবিটির এবং ডুভিনের অপমান হয়। অগত্যা ভদ্রমহিলাকে রাজি হতে হল।

যাঁরা তাঁর কাছ থেকে ছবি বা অন্য কোনো আর্ট বস্তু কিনতেন তাঁরাও কেন যে দর নিয়ে ইতস্তত করতেন তা ডুভিন কিছুতেই ভেবে উঠতে পারতেন না। ভবিষ্যতে সেটিই আবার কোনো মক্কেল বিক্রী করতে চাইলে ডুভিনই তা অনেক বেশি দামে বিক্রী করে দিতে পারতেন। ডুভিন নিজে ত কোনোদিন কার্পণ্য করেননি। অবশ্য এ্যানড্রু মেলনের মত ঘোড়েল ঘুঘু ক্রেতার ঘাড়ও তিনি নিপুণভাবে ভাঙতে পেরেছিলেন। নইলে ডুভিনের নামে যে কলঙ্ক পড়ে! রেম্‌ব্রান্তের 'এক যুবকের প্রতিকৃতি' চার লক্ষ দশ হাজার ডলার দিয়ে এবং একশ কুড়িটি পুরনো ইতালীয় ছবি তিরিশ লক্ষ ডলার দিয়ে তিনি

যেমন কিনেছিলেন, তেমনি র‍্যাফেলের একটি 'ম্যাডোনা', যাতে র‍্যাফেলের সই করা ছিল, সেটি তিনি মেলনকে দশ লক্ষ ডলারে গছাতেও পেরেছিলেন! এইসব অঙ্কগুলি দেখলে আমাদের দেশে অন্তত সেমিং সল্টের প্রয়োজন হয় অনেকেরই; কিন্তু ডুভিনের কাছে এইসব লেন-দেন ছিল এক পেয়ালা কফি খাওয়ার সামিল।

ডুভিন নিজে যখন কোন জিনিস বিক্রী করতে যেতেন তখন যে দাম ধরতেন তা ছিল বিধাতার ইচ্ছার মত অমোঘ, কোনো কারণেই বা কারুর অনুরোধেই তার নড়চড় হবার উপায় ছিল না। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ট্রেফাস্-সংগ্রহের তিনটি মূর্তি জুনিয়ার জন রক্‌ফেলারকে তিনি বিক্রী করতে চেয়ে দাম ধরলেন পনেরো লক্ষ ডলার। রক্‌ফেলারের দামটি খুবই বেশি মনে হল, তিনি দিতে চাইলেন দশ লক্ষ। ডুভিন মূর্তি তিনটে রকফেলারের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে চিঠিতে তাঁকে জানালেন যে ও-গুলি এক বছর তাঁর আশ্রয়ে থাক। ইতিমধ্যে তিনি মনস্থির করুন। এক বছর পরেও যদি তিনি পনেরো লাখ বেশি দাম মনে করেন, তাহলে স্বচ্ছন্দে এবং বিনা দ্বিধায় সেগুলি ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারেন। ডুভিন ঠিকই ভেবে-ছিলেন, লোভ অনেক সময় লাভকে পরাজিত করে, লালসা বলবতী হলে লক্ষ্যবস্তুকে নাগালের বাইরে যেতে দিতে নারাজ হয়। রক্‌ফেলার বছরের মধ্যে যদিও বারকয়েক জানিয়েছিলেন যে অত দাম দিয়ে মূর্তিগুলি তিনি রাখতে চান না, কিন্তু মেয়াদ পূর্ণ হবার শেষ তারিখে ঠিক পনেরো লাখ ডলারের চেক ডুভিনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এই দাম সম্পর্কে ডুভিনের মত খুব প্রবল আর দৃঢ় ছিল। কম দামে কেনা বা বেচা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি মনে করতেন এতে তাঁর মর্যাদা নষ্ট হবে, আর আর্টের জগতে মর্যাদার প্রশ্নই সব চেয়ে বড়। তাই তিনি নিজে যখন কোন জিনিস কেনা স্থির করতেন তখন সেটির আর তাঁর তাঁর হাতছাড়া হবার কোনো উপায় থাকত না, তাতে যত খরচই হোক না কেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আর্ট-ডিলাররা তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর উপর প্রতিহিংসা নিত, কারণ তারা জানত যে যতদিন ডুভিন বেঁচে আছেন ততদিন ভাঁটি ভাল জিনিস আর কারো হাতে যাবার উপায় নেই। সেইগুলিই আবার ডুভিন আরো চড়া দামে তাঁর মক্কেলদের কিনতে বাধ্য করতেন। তাঁরা প্রতিবাদ করলে তিনি বলতেন, "ওটি পেলেন বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করুন, আর তা সম্ভব হল শুধু আমি আছি বলে।" অ্যামে-রিকার কোটিপতিদের ডুভিন এই বহুমূল্য জ্ঞানটি দিতে চেয়েছিলেন। 'পিঙ্কি' ছবিটি কেনা নিয়েই এই শিক্ষাদানের একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নোয়েড্‌লার কোম্পানী মেলন প্রভৃতি কয়েকজন ধনীর সঙ্গে চুক্তি করেছিল যে তারাই তাঁদের ভাল-ভাল ছবি কিনে দেবে। যখন বিজ্ঞাপন বেরুল যে 'পিঙ্কি' লণ্ডনে নিলামে বিক্রী হবে তখন নোয়েড্‌লার কোম্পানীর এক পার্টনার ডুভিনের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে অনুরোধ করলেন, "আসুন, যুক্তভাবে আমরা ছবিখানি মেলনের জন্য ধরি।" চতুর ডুভিন তৎক্ষণাৎ বুঝে নিলেন যে আসল উদ্দেশ্য ছবিটির দাম কমের মধ্যে রাখা, যা তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করেন। তিনি সবিনয়ে এ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং নীলাম দারকে বলে দিলেন যে যত দামই হোক তার উপরে ডুভিনের ডাক রইল। প্যারীতে বসে তিনি খবরের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন, আশঙ্কা করতে লাগলেন যে মেলনের ঐ এজেণ্টদের কারসাজিতে দামটি শেষ পর্যন্ত দু' লক্ষ ডলারে দাঁড়াতে পারে। যখন খবর এল এমনকি ডুভিনও স্তম্ভিত হলেন। তাঁকে ছবিটি কিনতে হয়েছে পৌনে চার লক্ষ ডলারে।

যাই হোক তিনি অ্যামেরিকায় ছবিটি নিয়ে গিয়ে ছবিটি মেলনকে দিতে চাইলেন। মেলন তাঁকে জানালেন যে ছবিটি নেবার তাঁর খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ডুভিন যে অসম্ভব দাম দিয়ে সেটি কিনেছেন তাতে এখন আর তাঁর ঝোঁক নেই। ডুভিন তাঁকে বোঝাতে চাইলেন যে অমূল্য শিল্পের কাছে সব দামই তুচ্ছ, আর এমন ভয়ও দেখালেন যে দ্বিধা করলে মেলন ছবিটি হারাবেন, কারণ ওই দামেই আর একজন খরিদ্দার আছেন। মেলন হয়ত তাঁর কথায় বিশ্বাস করতে পারলেন না, ভাবলেন আগ্রহ না দেখালেই শেষ পর্যন্ত ডুভিন ক্ষতি স্বীকার করেও তাঁকে কম দামেই সেটি দেবেন। পরদিন সকালে ডুভিনের টেলিফোন পেয়েই স্যান মেরিণোর হাটিংডন এসে 'পিঙ্কি'কে ঘরে তুলে নিয়ে গেলেন। তার কিছুদিন পরেই আবার যখন লণ্ডনের নিলামে রমনির 'মিসেস

ড্যাভেনপোর্টের প্রতিকৃতি', ওই নোয়েড্‌লারদের চক্রান্তে ডুভিনকে তিন লক্ষ ডলারে কিনতে হল, সেবার আর মেলন ভুল করলেন না, ডুভিন ছবিটি তাঁর সামনে ধরতে তিনি তৎক্ষণাৎ সেটি কিনে নিলেন। কারণ আগের বার এ-শিক্ষা তাঁর হয়েছিল যে ডুভিন যে দামেই কোন আর্ট-বস্তু কিনুন না, লাভ রেখে সেটি তৎক্ষণাৎ বিক্রী করবার ক্ষমতাও তাঁর আছে।

এইসব কোটিপতিদের সূক্ষ্ম আর্টের দিকে চোখ খুলে দেবার জন্য ডুভিন এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন। ফরাসী চিত্রকর বোগেরোর মাংসল নগ্ন চিত্রগুলি দেখলে ডুভিনের গা ঘিন্‌ঘিন্ করত, জুগুপ্সায় ভ'রে উঠত তাঁর মন। এই ধরণের কুরুচি-কুৎসিত ছবিগুলি বাজার থেকে তাড়াবার মহৎ উদ্দেশ্য তাঁর ছিল। কিন্তু এই চিত্রকরের এই ধরণের একটি ছবি তিনি কিনে রেখে দিয়েছিলেন। 'পিকাসো' দিয়ে আর্ট সংগ্রহের পাঠশালায় হাতে-খড়ি হবার পর যদি কোনো মক্কেলের নারী-দেহের বক্র-রেখার দিকে প্রবণতা দেখা যেত, ডুভিন তাঁকে এই ছবিটি পাঠিয়ে দিতেন। কিছুদিন তাঁরা ছবিটির দিকে পরম রসোপলব্ধিতে বারবার তাকাতেন। ক্রমে এই স্থূলতা তাঁদের পীড়া দিত। তখন তাঁরা ছবিটি ডুভিনের কাছে ফেরত পাঠিয়ে সূক্ষ্মতর আর্টের নমুনা চেয়ে পাঠাতেন। বোগেরা'র নগ্নসুন্দরী এইভাবে বহুবার অল্পকালের জন্যে বহুবল্লভা হয়েছে।

ডুঁইফোড় লক্ষপতিরা লর্ড ডুভিনের পার্টিগুলিতে যোগ দেবার জন্য লালায়িত ছিল। ডুভিন হেসে বলতেন, "ওরা এখনো আমার মক্কেল হবার উপযুক্ত হয়নি। এখন কিছুদিন বাজারে যেখান-সেখান থেকে যা-তা ছবি কিনতে দাও।" এডসেল ফোর্ড সম্বন্ধেও তিনি একথা বলেছিলেন কিন্তু সাত ঘাটের জল খেয়ে একবার যাঁরা ডুভিনকে আর্ট-জগতের শাহান্ শা বলে স্বীকার করে নিতেন তাঁদের কাছে তাঁর নির্দেশ ছিল বাইবেলের আদেশের চেয়ে বেশী অলঙ্ঘনীয়। তাঁদের উপর ডুভিনের প্রতিপত্তির কাছে তাঁদের স্ত্রী-পুত্র কন্যার আবদারেরও দাম ছিল না।

একবার তাঁর এক মক্কেলের জন্য তিনি একটি বাড়ি ঠিক করেছিলেন। কিন্তু সেটি মক্কে-লের কন্যার পছন্দ হয়নি এই কারণে যে ভাত ঘরের সংখ্যা অনেকগুলি, যেগুলিকে পরি-চ্ছন্ন রাখতে প্রাণান্ত পরিশ্রম হবে। এই অভিযোগ শুনে ভদ্রলোক কন্যাকে বললেন, "কিন্তু জো (অর্থাৎ ডুভিন) যে বলেছে বাড়িটি চমৎকার। তারপর তিনি বাড়িটি কিনে ফেললেন। এদিকে মেয়েটি প্রতি-হিংসার সুযোগ খুঁজে বেড়াতে লাগল। সুযোগ জুটেও গেল। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ডুভিন তার বাবাকে অনেকগুলি খাঁটি মূল্যবান ছবি কিনে দিলেন এবং তাঁর কথামত সেগুলি বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের দেখাবার জন্য এক ভোজসভার আয়োজন হল। এই ভোজসভায় ডুভিন ছাড়া আর একজন নাম করা আর্ট-বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন, তিনি একজন ফরাসী কাউণ্ট। মেয়েটি কাউণ্টকে নিয়ে তার বাবার সদ্য-কেনা ছবিগুলি দেখাতে লাগল। ভদ্র-লোক ছবিগুলির প্রশংসাই করতে লাগলেন। কিন্তু ডুবার-এর যে-ছবিটি ডুভিন তাঁর মক্কেলকে দেড় লক্ষ ডলারে কিনে দিয়ে-ছিলেন তার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে কাউণ্ট ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, "আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি—এটি আসল ডুবার নয়, অন্য কারুর আঁকা।"

মেয়েটির পিতা এবং ডুভিন কাছেই ছিলেন মেয়েটি তৎক্ষণাৎ চেঁচিয়ে বলল, "শুনুন বাবা, কাউণ্ট বলেছেন ছবিটি ডুবারের আকা নয়। মেয়েটির মুখ তখন বিজয়-গর্বে দীপ্ত। তার বাবা আর ডুভিন

এগিয়ে এলেন। এদিকে কাউন্টের মুখ ততক্ষণে শুকিয়ে গেছে। মেয়েটির পিতাও পাংশু মুখে ডুভিনের দিকে তাকালেন। ডুভিন হাসলেন তাঁর সেই সুপ্রসিদ্ধ হাসি। তারপর বললেন,"মজার কথা, ভারী মজার কথা। শুধু উনি কেন, পৃথিবীর অনেক নাম করা আর্ট-বিশেষজ্ঞ এই ছবিটিকে ডুবারের আঁকা বলে মনে করেন না।" সেই অগণিত অদৃশ্য বিশেষজ্ঞদের ভীড়ের মধ্যে পড়ে কাউন্ট ও তাঁর মত হারিয়ে গেল তিনি লজ্জিত মুখে অন্য দিকে সরে পড়লেন।

ডুভিনের মৃত্যুর পর তাঁর শত্রুরাও বলেছিলেন, 'আর্টের জগত থেকে একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব চলে গেল।" অ্যামেরিকার কোটিপতিদের দিয়ে ইউরোপের যে শ্রেষ্ঠ চিত্রসম্ভার তিনি কিনিয়ে ছিলেন সেগুলি সেদেশের জাতীয় সম্পদ হয়ে ওয়াশিংটনের ন্যাশানাল গ্যালারীর শোভাবর্ধন করছে। সেখানে মেলনের সংগ্রহ করা আর উপহার দেওয়া ছবিই সংখ্যায় বেশি। মেলন ছিলেন ডুভিনের সবচেয়ে সেরা মক্কেল।

প্যারী শহরে বহুবার যাতায়াতের ফলে সেখানকার নৌবিভাগের বাড়িটি ডুভিনের খুব মনে ধরেছিল। সেটি রাজা পঞ্চদশ লুই-এর প্রিয় স্থপতির তৈরী। ডুভিন তাঁর ছবির গ্যালারীর জন্য নিউইয়র্কে কিফথ এ্যাভিনিউ ও ফিফটি সিক্সথ ষ্ট্রীটের মোড়ে জমি কিনে ফিলাডেলফিয়ার সুপ্রসিদ্ধ এঞ্জিনিয়ার হোরেস ট্রাম্-ব্যুয়ারকে দিয়ে অনুরূপ একটি বাড়ি তৈরী করালেন। এমনকি পাথরগুলি পর্যন্ত ফ্রান্স থেকে আনা হল।

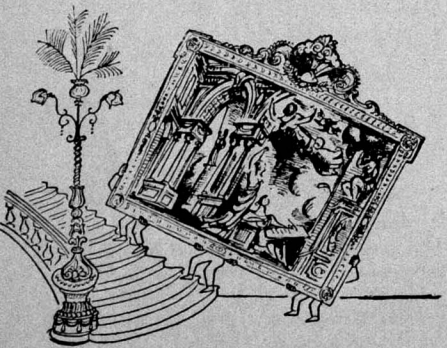

সবশুদ্ধ খরচ পড়ল দশলক্ষ ডলার! কিন্তু যাঁরা লক্ষ লক্ষ ডলারের ছবি কিনতে আসবেন তাঁদের অভ্যর্থনা করবার উপযুক্ত স্থান তো চাই।

তাঁর চেহারা ছিল একজন সাধারণ ইংরেজ ব্যবসায়ীর মত। মোটা এবং বেঁটে। গায়ের রঙ ছিল লাল। গোঁফ নিপুণভাবে দুপাশে ছাঁটা। কিন্তু তাঁর কটা চোখ দুটিতে ছিল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। তাঁকে দেখলেই মনে হত তাঁর অর্থের সীমা-পরিসীমা নেই। কখনো কখনো গল্‌ফ খেলতেন বা কদাচিৎ থিয়েটারে যেতেন। আসলে নিজের কাজ ছাড়া অন্য কিছুতেই তাঁর অনুরাগ ছিল না। তাঁর সঙ্গে সব সময় সামান্য কিছু অর্থ থাকত। ছোট অঙ্কের অর্থের হিসাব তিনি বুঝতেন না, তিনি কোটি কোটি ডলারের কারবারী। তাঁর নিত্য প্রয়োজনের জন্য যা সামান্য অর্থ লাগত তা তাঁর খাস চাকর তাঁর পোষাক গুছিয়ে রাখবার সময় কোটের পকেটে রেখে দিত। একবার এই চাকরটির অসুখ হলে ডুভিন হতাশ ভঙ্গীতে বলেছিলেন যে তাঁকেও শয্যা নিতে হবে, কারণ তাঁর ট্যাক্‌সি খরচ আর কে তাঁকে দেবে! এছাড়া ডুভিনের বাদশাহী ভাবভঙ্গী ছিল। অনুচরদের ডাকতেন তিনি হাততালি দিয়ে। ঐ শব্দ শুনে সকলকে সমব্যস্তে ছুটে আসতে হত। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বনেদী গম্ভীর আবহাওয়াতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। রাজনীতির তিনি ধার ধারতেন না কোনদিন। তবে মাঝে মাঝে তাঁর মনে পড়ে যেত যে তিনি একজন লর্ড এবং ইংল্যাণ্ডের লর্ডসভায় তাঁর বসবার অধিকার আছে। তাই কখনো কখনো তাঁকে বলতে শোনা যেত, "ভারী দুঃখিত, আমার এখন একটুও সময় নেই। এখনি হাউস অব লর্ডস-এ যেতে হবে। একটা বিশেষ জরুরী বিষয়ের আলোচনা হবে আজ।"

কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ফুর্তিবাজ লোক। এক এক সময় তা প্রায় ভাঁড়ামিতে পরিণত হত। নিজেকে জাহির করবার একটা উগ্র ইচ্ছাই হয়তো থাকত তার মূলে। প্রসিদ্ধ লেখক সার অস্বার্ট সিট্‌ওয়েল তাঁর "লেফট হ্যাণ্ড, রাইট হ্যাণ্ড!" নামক পুস্তকে নিচের ঘটনাটি লিখেছেন :

"নিউইয়র্কে অনেকবার লর্ড (তখন সার জোসেফ) ডুভিনের সম্পর্কে এসেছি। তাঁর বাড়িতেও বহুবার গেছি। তার পরের বছর ইংল্যাণ্ডে লিস্টার

গ্যালারীর এক এগ্‌জিবিশনে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল। তিনি আমার কাছে প্রায় ছুটে এসে বললেন, এই যে মিস্টার লিটন স্ট্র্যাচি! আপনার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাওয়ায় ভারী আনন্দ পেলাম। এই বলে তিনি পরম উৎসাহেরসঙ্গে আমার করমর্দন করলেন।

লিটনের সঙ্গে আমার চেহারায় কোন সাদৃশ্য নেই। আমি দীর্ঘাকৃতি, স্বাস্থ্যবান। আমার রঙ ফর্সা এবং আমি দাড়ি গোঁফ নিপুণভাবে কামাই। লিটন কোল-কুঁজো, রোগা, একমুখ গোঁফ দাড়ি। আকৃতিতে এ-রকম বিসদৃশ আর দুটি লোক বোধ হয় পৃথিবীতে পাওয়া যাবে না। অথচ সার জোসেফ্ ডুভিন আমাকে লিটন স্ট্র্যাচি বলে ভুল করলেন কি করে! আমি ব্যাপারটা লিটনকে তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম করে জানালাম। লিটন টেলিগ্রামেই উত্তর দিল, 'আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে কাজটি ডুভিনের উপযুক্তই হয়েছে।' ডুভিন এই দুটি টেলিগ্রামের খবরই পেয়েছিলেন এবং হয়ত প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। কারণ এরপর অনেক ভোজ-টেবলে আহারাদির পর আসর জমাবার জন্য তিনি অম্লানবদনে আমাকে অনুরোধ করেছেন—'বলুন না, সেই লিটন স্ট্র্যাচির গল্পটা। এঁদের শুনিয়ে দিন।' গল্পটি বলা শেষ হলে তিনি বলতেন, 'অবশ্য অস্বার্ট সিট্‌ওয়েলকে আমি ভালভাবেই জানতাম। তিনি আমার দেশ ইংল্যাণ্ডকে নিয়ে কত চমৎকার লেখাই না লিখেছেন!' তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা আর ব্যক্তিত্বকে ঢাকার জন্যই তিনি মাঝে মাঝে এই রকম বোকামি ও ভাঁড়ামির মুখোশ পরতেন?" (চলবে)

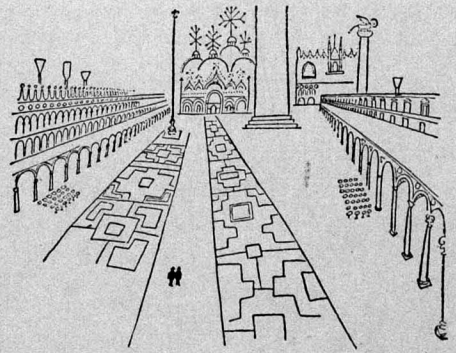

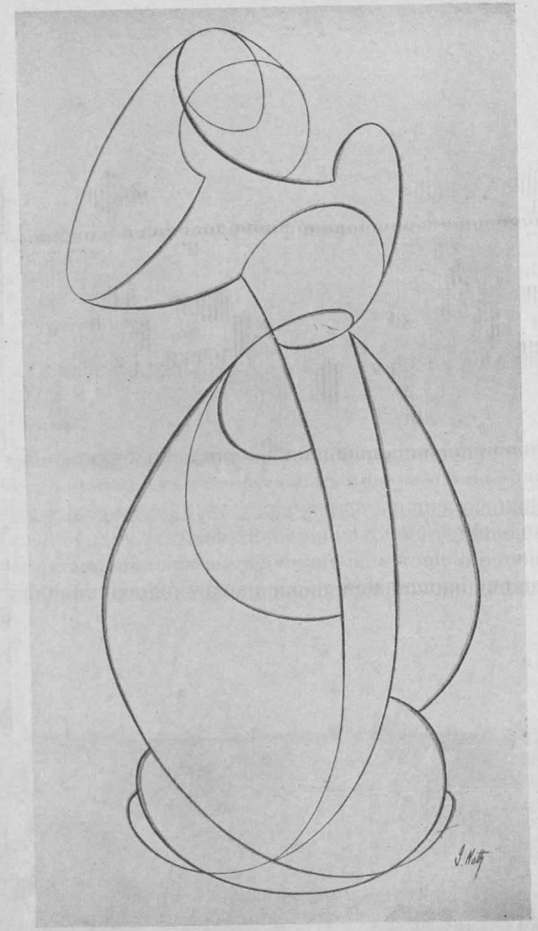

সতীন্দ্র নাথ অঙ্কিত একটি রেখাচিত্র

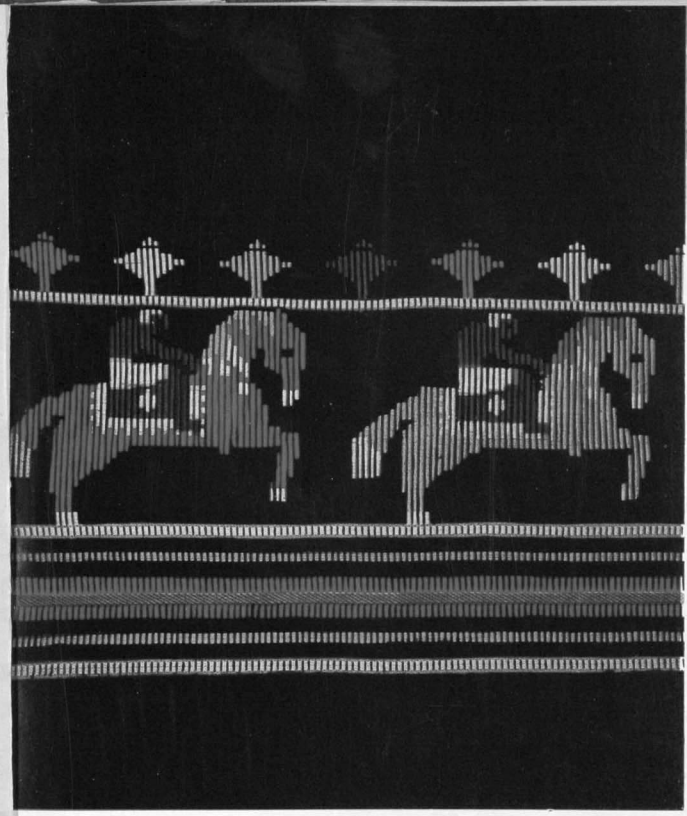

উদয়ভিলায় তৈরী একটি বেড-কভার।

উদ্বাস্তুদের শিল্পকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি

দুঃস্থা অসহায়া নারীদের বাঁচবার পথ করে দিতে আজ থেকে আঠারো বছর আগে স্বর্গীয়া লেডী অবলা বসু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'নারী শিক্ষা সমিতি' 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন' প্রভৃতি। নারীদের সমবায় আন্দোলনের পুরোধারূপে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার সার্থক নিদর্শনরূপে দাঁড়িয়ে আছে উদয়ভিলা—'নারী সমবায় শিল্পাশ্রম'। কামারহাটিতে পঁচাশী বিঘা জমির ওপর অতীতের বিলাসব্যসনের ক্লান্ত পরিণতির স্বাক্ষর বহন করে দাঁড়িয়ে ছিল বাগান-

উদয়ভিলায় তৈরী একটি বেড-কভার।

উদ্বাস্তুদের শিল্পকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি

দুঃস্থা অসহায়া নারীদের বাঁচবার পথ করে দিতে আজ থেকে আঠারো বছর আগে স্বর্গীয়া লেডী অবলা বসু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'নারী শিক্ষা সমিতি' 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন' প্রভৃতি। নারীদের সমবায় আন্দোলনের পুরোধারূপে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার সার্থক নিদর্শনরূপে দাঁড়িয়ে আছে উদয়ভিলা—'নারী সমবায় শিল্পাশ্রম'। কামারহাটিতে পঁচাশী বিঘা জমির ওপর অতীতের বিলাসব্যসনের ক্লান্ত পরিণতির স্বাক্ষর বহন করে দাঁড়িয়ে ছিল বাগান-

বাড়ি উদয়ভিলা। সেখানে চলেছে আজ দুশো-পঞ্চাশটি মেয়ের মানুষের মত বাঁচবার সাধনা। সমাজের কাছে যারা বোঝা মাত্র, অর্থনৈতিক চাপে যারা নিষ্পেষিত, উদ্বাস্তুত্বের অভিশাপে যারা পর্যুদস্ত, সেই তাদেরই স্বপ্নে গড়া এই উদয়ভিলার পরিবেশ দর্শকমাত্রকেই বিহ্বল করে।

শ্রমের মধ্য দিয়ে, সংগঠনের মধ্য দিয়ে কর্ম-নৈপুণ্যের উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান যশ অর্জন করেছেন যথেষ্ট এবং যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে, প্রত্যেকটি প্রস্তুত জিনিষে উন্নততর কলা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে রুচিশীল ক্রেতাসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এঁরা।

বাংলার লোকসংস্কৃতির বাহক লোকশিল্পের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা এই সমিতির অন্যতম আদর্শ। পটে, পুতুলে, সজ্জায়, আল্পনায়, আমাদের গ্রামীণ শিল্পসম্ভার উপযুক্ত সাহায্য না পেয়ে আজ মরে যেতে বসেছে। এই লোকশিল্পের পুনরুদ্ধার ও তার বলিষ্ঠ প্রয়োগ কারু-শিল্পের বাজারে সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মসচেতনার দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে এই উপলব্ধি করতে পেরেছেন এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, এটা সত্যই আশার কথা। তাই এর সমস্ত বিভাগের প্রস্তুত দ্রব্যাদিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করবার জন্য একটি কলাবিভাগ নিয়মিত অনুশীলন করে চলেছে। এই বিভাগটির আদর্শ হচ্ছে আমাদের লোকশিল্পের ধারাকে জানা ও বিভিন্ন মাধ্যমে তাকে প্রয়োগ করা।

বাংলাদেশের মেয়ে—শিল্পপ্রবণতা যাঁদের সহজাত, উপযুক্ত অনুশীলন ক'রে তাঁরা সহজেই এগিয়েছেন শিল্পসৃষ্টির কাজে।

তাঁদের তৈরি ডিজাইনের আবেদন সহজ। অ্যানাটমির কচকচির চেয়ে ছন্দের আবেদন বেশি। রং যা ব্যবহার করেন, তা দেশী ও সহজলভ্য। বিষয়-বস্তুর নির্বাচনও পারিপার্শ্বিক ও প্রকৃতির মধ্য থেকে। তাই, তাঁদের সৃষ্ট নক্সাগুলো দেখলে অত্যন্ত সহজেই নিজেদের বলে চিনতে পারা যায়। বোঝা যায়, এ নক্সা আমাদেরই জীবন বা ফুল-পাতা-লতার আলঙ্কারিক নতুন করে ধরা প্রতিচ্ছবি মাত্র। এই বৈশিষ্ট্যই স্বদেশে ও বিদেশে এঁদের প্রস্তুত জিনিষের চাহিদা ও প্রশংসা দুই-ই বাড়িয়েছে যথেষ্ট এবং তা অবশ্যই প্রাপ্য।

শুধু ডিজাইন নয়, বাঁশ, পাটি, দেশী কাগজ, মুগা কাপড় প্রভৃতি ব্যবহার করে যে সব উপহারপত্র, ক্যালেণ্ডার মাটির ফুলদানি, পুতুল, এবং আরও বিভিন্ন ধরনের ঘরদোর সাজানোর জিনিষ এঁরা তৈরি করে চলেছেন, তা বেশ অভিনব। বিদগ্ধ ও সাধারণ ক্রেতাসমাজে এঁদের প্রস্তুত জিনিষের চাহিদা বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। এঁদের কলা-বিভাগটির কর্মপদ্ধতি এবং সাফল্য অনেক প্রতিষ্ঠানকেই কলাবিভাগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করেছে।

॥ ভাদ্র ও আশ্বিন

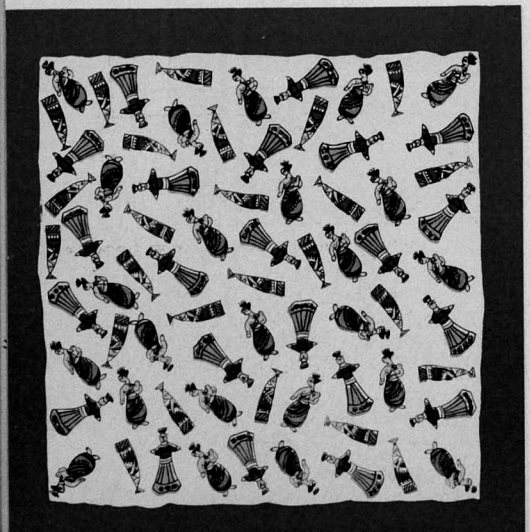

হাতে ছাপা মুর্শিদাবাদ সিল্কের একটি বড় রুমাল

আমরা সর্বান্তঃকরণে এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানটির সাফল্যের মূলে রয়েছে কর্মসচিব শ্রীমতী বীণা দাশের কর্মক্ষমতা ও শিল্পানুরাগ। আর রয়েছে তাঁরই তত্ত্বাবধানে কর্মরত শিল্পী শ্যামাদাস সেনগুপ্তের ঐকান্তিক চেষ্টা ও আগ্রহ। 'নিখিলভারত হস্তশিল্পসংস্থা' এই শিল্পীকে হস্তশিল্প-শিক্ষা ও গবেষণার জন্যে পাশ্চাত্য দেশে পাঠাবেন ঠিক করেছেন। নিঃসন্দেহে এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত চিত্রগুলি এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে প্রস্তুত কয়েকটি জিনিষের নমুনা। এর প্রত্যেকটিই নতুনত্বের আস্বাদ আনে।

প্রথমটি, একটি বেডকভারের নমুনা। এর ডিজাইনটি 'এক্সট্রা ওয়েফ্‌ট' পদ্ধতিতে হাতে বোনা।

দ্বিতীয়টি একটি মাথায় বাঁধার রুমাল অথবা হেড স্কার্ফ, যাতে বাঁটি সিল্কের ওপর হাতে ছাপা বাংলার বিভিন্ন পুতুলের ব্যবহার করা হয়েছে অতি সুন্দরভাবে।

পট, পুতুল ও আলপনার মাধ্যমে এঁরা হাতে-ছাপা কাপড়ের নক্সার মধ্যে অভিনবত্ব এনে দিয়েছেন।

তৃতীয়টি একটি ক্যালেণ্ডার। মাদুর উপযুক্ত হাতে পড়লে দেওয়ালের শোভা বর্ধনের কতখানি কাজে লাগতে পারে তার নিদর্শন এঁদের তৈরী এই ক্যালেণ্ডারটি দেখলেই বোঝা যাবে। বাঁশ, পাটি ও এই মাদুর সহযোগে এঁদের হাতে আঁকা ক্যালেণ্ডারগুলি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

চতুর্থটি এঁদের একটি নতুনতম সার্থক এক্সপেরি-মেণ্ট। এটিও একটি বড় রুমাল। সিল্কের ওপর রং দিয়ে ডিজাইনগুলি এঁদের শিল্পীকর্মীরা হাতে এঁকে দেন এবং তা অন্যান্য ছাপা কাপড়ের মত বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে পাকা করা হয়, যাতে জিনিষটির রং দৈনন্দিন ব্যবহারেও নষ্ট না হয়।

মাদুরের উপর হাতে আঁকা ক্যালেণ্ডার।

পঞ্চমটি এঁদের হাতে আঁকা অভিনন্দন অথবা উপহার-পত্রের একটি নমুনা, যা এঁরা হাতে এঁকে প্রতিমাসে কমপক্ষে তিন চার হাজার বিক্রয় করেন। হাতে তৈরী দিশী কাগজ ও মুগার ওপর আঁকা এই উপহার-পত্রগুলি ইতিমধ্যেই রুচিশীল ক্রেতাসমাজে সাড়া এনে দিয়েছে।

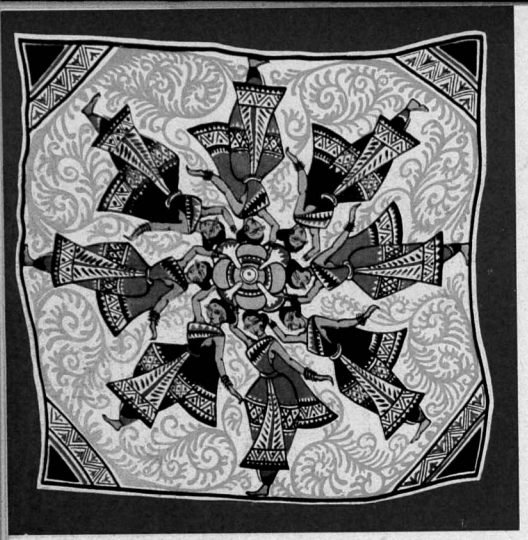

সিল্কের উপরে হাতে আঁকা বড় রুমাল।

প্রবন্ধে উল্লিখিত অপর পৃষ্ঠার ছবিটিই হচ্ছে মাদুরের উপর আঁকা ক্যালেণ্ডার। সাঁওতালদের নৃত্যের ছন্দোময় রূপ পরিস্ফুটনে শিল্পীদের মৌলিকত্ব প্রকাশ পেয়েছে। গ্রামীণ দৃশ্যের সঙ্গে মাদুর এবং বাঁশের ব্যবহার সত্যি সুন্দর।

পাশের চিত্রটি পূর্বে উল্লিখিত উদয়ভিলার উদ্বাস্তু শিল্পীদের হস্তশিল্পের সাফল্যমণ্ডিত নিদর্শন সমূহের অন্যতম। এই রুমালে বিচিত্র নৃত্যভঙ্গিমায় চক্রাকারে যে নারীমূর্তিগুলি অঙ্কিত হয়েছে তাতে ঘূর্ণায়মান গতি চমৎকারভাবে ফুটে উঠার সুনিশ্চিত সুযোগ পেয়েছে।

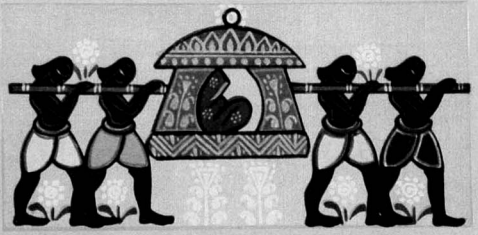

দুখা সিল্কের উপর হাতে আঁকা অভিনন্দন বা গ্রীটিংস কার্ড।

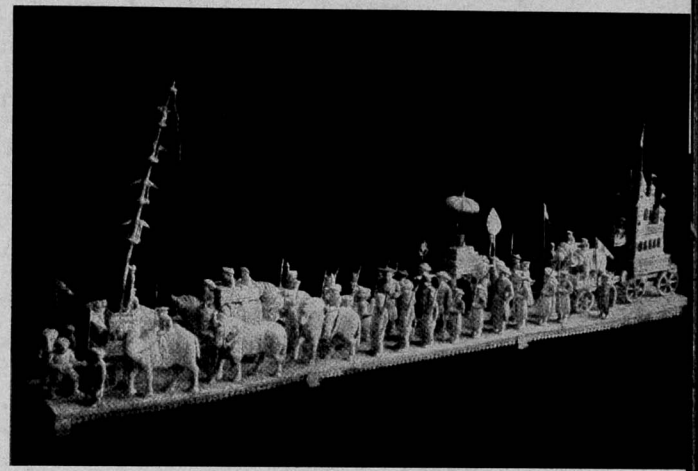

মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের তৈরী একটি শোভাযাত্রার দৃশ্য।

হাতির দাঁতের কাজ

বিশ্বনাথ চৌধুরী

হাতির দাঁতের কাজ শিল্প হিসাবে যে কত প্রাচীন তার ইতিহাস উদ্ধার করা হয়ত এখন সম্ভব নয়। ঋগ্বেদ, বৃহৎসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে হাতির দাঁতের তৈরী দ্রব্য সম্ভারের উল্লেখ থাকাতে মনে হয় আর্যসভ্যতার পূর্বেও এই শিল্পের সমৃদ্ধি ও বিস্তার সম্ভব হয়েছিল।

হস্তিদন্তখচিত কারুকার্যে অদ্বিতীয় পণ্যদ্রব্যগুলি বিদেশে রপ্তানি হতো। একদা শিল্প ও সৌন্দর্যের অনুপম নিদর্শন হিসাবে এগুলি পৃথিবীর সর্বত্র সুধীজনের সপ্রশংস স্বীকৃতিলাভ করে ধন্য হয়েছিল।

বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের কাব্যজগতে গজমোতির মালা শুধু অমূল্য সম্পদ নয়, সৌন্দর্যে অতুলনীয় বলে রূপায়িত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতে দিল্লী, অমৃতসর দেরা-ইসমাইল-খান মুলতান, হোসিয়ারপুর, দেরা-গাজী-খান, গুজরাট, লাহোর পাতিয়ালা প্রভৃতি স্থানে হাতির দাঁতের কাজ শিল্প হিসাবে প্রসার লাভ করেছিল।

মহারাজা রণজিৎ সিংহের সময়ে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির, লাহোরের সুবৃহৎ অট্টালিকার আসবাবপত্র হস্তিদন্তের কারুকার্যে অলঙ্কৃত হয়েছিল হোসিয়ার-পুরের কুশলী শিল্পীদের কলানৈপুণ্যে।

ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে, হোসিয়ারপুর থেকে হস্তিদন্তনির্মিত বহু শিল্পসম্ভার ইউরোপ, আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি হতো। প্রথমে শুধু ছুরি, চৌকি, চারপায়া তৈরী হতো, পরে রপ্তানির জন্য টেবিল, চেয়ার, ছবির ফ্রেম, ফটোগ্রাফ-ট্রে, হ্যাট-র‍্যাক প্রভৃতি তৈরী হতে লাগল।

পাতিয়ালার মহারাজা এ বিষয়ে উৎসাহ দেবার জন্য কয়েকজন কারিগরকে বৃত্তি দিতেন। এইসব কারিগরদের হাতের কাজ সেই সময়ে লাহোর ও কল-কাতার শিল্প-প্রদর্শনীতে প্রশংসা অর্জন করেছিল।

হিন্দু মুসলমানের বিবাহ অনুষ্ঠানে হাতির দাঁতের চুড়ি বা বালার ব্যবহার বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল—বিবাহের দিন কন্যার মাতুল একজোড়া হাতির দাঁতের বালা উপহার পাঠাতেন।

তখনকার দিনে হাতির দাঁতের বিলিয়ার্ডবল প্রচুর পরিমাণে বিদেশে চালান যেত।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতার এক প্রদর্শনীতে পাঞ্জা-বের অমৃতসর, লুধিয়ানা, দেরা-গাজী-খান, হোসিয়ারপুর, লাহোর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান থেকে ৩৭৫টি হাতির দাঁতের তৈরী জিনিষ প্রদর্শিত হয়েছিল।

১৮৮৩ সালের প্রদর্শনীতে দিল্লীর ফকির চাঁদ এবং অমৃতসরের দেবী মালের কারুকার্য-খচিত গজদন্তের বিচিত্র শিল্পসম্ভার সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বাংলাদেশে হাতির দাঁতের কারুশিল্প একমাত্র মুর্শিদাবাদে আর রংপুর জেলায় প্রচলিত ছিল। রংপুরে শুধু নামমাত্র—গজদন্ত-শিল্পে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রসিদ্ধি সর্বজনবিদিত। রংপুরের কুড়িগ্রামে পঞ্চাশ বছর আগে মাত্র ছয় ঘর কারিগর বাস করত। পদ্মর রাজা বিহার থেকে এই ছয় ঘর কারিগরকে জায়গীর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে এইসব কারিগর তাদের শিল্পকর্ম ত্যাগ করে গ্রাসাচ্ছাদনের তাগিদে কৃষিকর্ম বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে। রংপুরের শিল্পীরা হাতির দাঁতের পাশা, দাবার গুটি, চিরুণি বালা ইত্যাদি রকমারি জিনিষ নিপুণভাবে তৈরী করত। মুর্শিদাবাদকে হাতির দাঁতের প্রধান শিল্পকেন্দ্র বলা চলে।

এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। একদিন মুর্শিদাবাদের নবাবের ইচ্ছা হল কানে সুড়সুড়ি দেবেন—বুদ্ধি করে একজন তৃণখণ্ড নবাবের হাতে দিলেন। উপেক্ষাভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করে নবাব বললেন : এ কি নবাব নাজিমের কানে ব্যবহার করবার উপযুক্ত জিনিষ? হাতির দাঁতের কান-খোঁচার কাঠি নিয়ে এসো।

তারপর দিল্লী থেকে একজন কারিগর এল, সেই কারিগরের সাধনায় পুষ্পিত হয়ে উঠল তার শিল্পরচনা—কারুকর্মের নিপুণতায় হাতির দাঁতের কাজ মুর্শিদাবাদে এক নতুন যুগের সূচনা করল—কিন্তু এই কারিগর ছাড়া এই শিল্পের যাদুমন্ত্র আর কারও জানা ছিল না—কারিগর কাউকে কাছেও ডাকত না। তার নির্জন একাকীত্ব কেউ ভঙ্গ করতে সাহস করত না। একজন হিন্দু শিল্পী চুরি করে একটা ছিদ্র দিয়ে এই কারিগরের কাজ লক্ষ করত—তার ধৈর্য ছিল অপরিসীম—সুন্দরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে সে কারিগরের কাজ অনুশীলন করার চেষ্টা করত।

ক্রমে সে নিজেই আরম্ভ করল। এই অজ্ঞাত কারিগরের পুত্র তুলসী খাত্তর মুর্শিদাবাদের সেই কারিগর হিসাবে একদা খ্যাতি লাভ করেছিল। তুলসী কারিগরের প্রতিভাকে মলিন করে দেবার মত আজও কোন শিল্পী মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেনি।

আজও মুর্শিদাবাদের কারিগরেরা তুলসীর নাম স্মরণ করে অবনতমস্তকে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তুলসী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসক, পরম বৈষ্ণব বলে খ্যাত ছিল। তীর্থ পর্যটনের উদগ্র বাসনায় তার মন সব সময় চঞ্চল থাকত। নবাব তাকে সতর্ক প্রহরীর বেষ্টনে রাখতেন যাতে সে হঠাৎ পালিয়ে যেতে না পারে, যাতে তার শিল্প-প্রতিভার পরিপূর্ণ ফল তিনি একান্তভাবে উপভোগ করতে পারেন।

একদিন ভাগীরথীতে অবগাহন করতে গিয়ে তুলসী অবলীলাক্রমে স্রোতে গা ভাসিয়ে ওপারে রাজমহলে পালিয়ে গেল; সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু নেই,

কোনরকমে যন্ত্রপাতি ধার করে, সে একটি সুন্দর ঘোড়া তৈরী করে পাঁচ টাকা দামে সেটা বিক্রী করল এবং এই পাঁচ টাকা মূলধন করে সে গয়ায় পাড়ি দিল, সেখান থেকে কাশী।

কাশীতে তুলসী গজদন্ত খরিদ করে বৃন্দাবনে গেল। সেখানে কিছু যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে হাতির দাঁতের কয়েকটি মূল্যবান জিনিষ তৈরী করল। সেখান থেকে রাধাগোবিন্দজীর দর্শন অভিলাষে জয়পুরের পথে রওনা হল।

তুলসী জয়পুরের মহারাজাকে হস্তিদন্ত কারুকার্য-খচিত কিছু সামগ্রী উপহার দিল—সেগুলি আজও তার শিষ্যদের কাছে শিল্পপ্রতিভার অপূর্ব সৌন্দর্যের নিদর্শন হিসাবে অভিনন্দিত হয়ে আসছে। মহারাজার আদেশে তুলসী তার পালিত ছাগলের একটি প্রতিমূর্তি হাতির দাঁতে ফুটিয়ে তুলল—মহারাজা দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁর কাছে যা কিছু মূল্যবান জিনিষ ছিল তাই দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করলেন শুধু তাই নয় নগদ দু'হাজার টাকা অতিরিক্ত দিলেন।

সতর বছর নানা তীর্থ পর্যটন করে তুলসী তার বাসভূমি মুর্শিদাবাদে ফিরে এল।

এই সতর বছরের মধ্যে পূর্বের নবাব গত হয়েছেন, তাঁর পুত্র তখন সিংহাসনে সমাসীন। ছোট-নবাব তাঁর পিতার প্রতিকৃতি তৈরী করার জন্যে আদেশ দিলেন—তুলসী অবিকল সেই প্রতিকৃতি তার স্মৃতির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলল।

এমন সুন্দর হয়েছিল সেই প্রতিমূর্তি, নবাব মুগ্ধ হয়ে তার সতর বছরের সমস্ত বকেয়া বেতন চুকিয়ে দিলেন। উপরন্তু মুর্শিদাবাদের কাছে মহাজনটুলীতে বাস করার জন্যে খুব সুন্দর একখানি অট্টালিকা তৈরী করিয়ে দিলেন। তুলসী কারিগরের প্রিয় শিষ্য মানিক আর রামকিশোর। এদেরই বংশধরগণ এখনও মুর্শিদাবাদে হাস্তির দাঁতের শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে। পূর্বে শ্রীহট্টে হাতির দাঁতের কাজের প্রচলন ছিল—হাতির দাঁতের মাদুর ও পাখা শ্রীহট্টের গর্বের সামগ্রী ছিল। মুসলমান রাজত্বের সময়ে শ্রীহট্টের শিল্পীরা রাজধানী ঢাকা এবং পরে মুর্শিদাবাদে এসে ডেরা বাঁধল।

মুর্শিদাবাদের কারিগরেরা জাতিতে বৈষ্ণব। আগে প্রতিমা তৈরী করত, পরে হাতির দাঁতের নানরকমের জিনিষ তৈরী করতে লাগল।

কারিগরসম্প্রদায় একদিক দিয়ে খুব নীতি মেনে চলে। তারা অন্য সম্প্রদায়ের লোককে শিক্ষানবীশ হিসাবে গ্রহণ করে না, নিজেরা পরস্পরকে উন্নতির জন্যে চিরদিনই সাহায্য করে। সেইজন্যেই সহজে কেউ দুরবস্থার মধ্যে পড়ে না।

কারিগররা রুচিসম্পন্ন, উন্নত স্তরের জীবন ধারণে অভ্যস্ত। তাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার ভদ্রশ্রেণীর

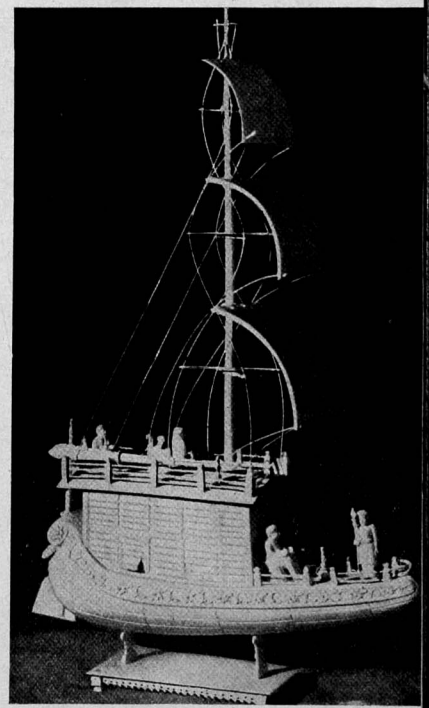

বাংলার হাতির দাঁতে তৈরী গণ্ডভিঙার একটি ডিঙা।

সঙ্গে সমতুল্য ; অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম চলে না। ব্যবসাবুদ্ধি এই কারিগরদের একেবারে নেই। ব্যবসা কিম্বা জমা-খরচ আয়-ব্যয় সম্পর্কিত কোন কিছুরই হিসাব রাখতে তারা অভ্যস্ত নয়। টাকা দিয়ে কাঁচা মাল কেনে, জিনিষ তৈরী করে বিক্রী করে। টাকা না থাকলে মহাজনের কাছে ধার করে, আবার সুবিধা-মত শোধ দেয়। বছরে কত আয় আর কত ব্যয় হল তা কেউ বলতে পারে না।

বছরে ছ'শো আট'শো টাকা আয় হলেও তারা কিছু জমাতে পারে না। বেহিসাবী খরচ করা তাদের স্বভাব। এক সময়ে চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, পাটনা, কটক প্রভৃতি স্থানে হাতির দাঁতের শিল্পচর্চায় অনেকে মন দিয়েছিল। এখন তার চিহ্নমাত্র বর্তমান নেই।

মুর্শিদাবাদের এই কারিগরেরা তাদের কাঁচা মাল কলকাতা কিম্বা আজিমগঞ্জের মেঘরাজবাহাদুরের কাছ থেকে সংগ্রহ করত, মেঘরাজ হাতির দাঁত সরবরাহ করে এবং তৈরী জিনিষ কিনে নিয়ে কলকাতার বাজারে বিক্রী করত।

মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা আসাম অথবা রেঙ্গুনের হাতির দাঁত নরম এবং হাল্কা বলে পছন্দ করত।

পঞ্চাশ বছর আগে বিভিন্ন শ্রেণীর হাতির দাঁত নিম্নলিখিত মূল্যে বিক্রী হত।

নক্সী দাঁত—প্রতি সের ৮-১০ টাকা।
খণ্ডী দাঁত—প্রতি সের ১৬ টাকা।
গলহর দাঁত—প্রতি সের ৮ টাকা।

মুর্শিদাবাদের কারিগরেরা সাধারণত কাঠের কাজের মিস্ত্রীরা যে সব যন্ত্র ব্যবহার করে থাকে, তাই ব্যবহার করে, তবে তা আকারে ছোট এবং সূক্ষ্ম ধরনের। পছন্দমত যে জিনিষটি তৈরী করবে তার জন্যে যতটা হাতির দাঁত দরকার, তা প্রথমে যন্ত্রের সাহায্যে কেটে নেয়, তারপর পেন্সিল দিয়ে যা তৈরী করা হবে তা হাতির দাঁতের ওপর রেখার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলে। তারপর শিল্পী নিখুঁতভাবে কেটে কেটে হাতির দাঁতের ওপর নানারূপ নক্সা রূপান্তরিত করে।

চিত্রে বিভিন্ন অবস্থায় একটি গরু কি করে সম্পূর্ণভাবে তৈরী হল তা দেখানো হয়েছে। করাতের সাহায্যে হাতির দাঁত কাটা হয়—ফাইলের সাহায্যে ইচ্ছামত মসৃণ করা হয়। আবশ্যকমত ড্রিল দিয়ে ছিদ্র তৈরী করা হয়।

হাতির দাঁত জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। পরে খড়ির গুঁড়ো দিয়ে মসৃণ করা হয়।

ইউরোপের সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মধ্যে এখনও মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের শিল্পনৈপুণ্য সমাদর পেয়ে আসছে, কারণ হাতির দাঁতের কারুকার্য ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব জিনিষ। তাই, আজও তা ভারতের বাইরে সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়ে আসছে। মান্দালয়ের হাতির দাঁতের পাখা, সিলেটের মাদুর, মুর্শিদাবাদের দুর্গা প্রতিমা, দিল্লীতে তৈরী তাজমহলের বিদেশীর কাছে একটা বিশেষ মূল্য আছে। কারিগরের শিল্পচাতুর্য তার সৃষ্টির মধ্যে ধরা পড়েছে। প্রফেসার F. F. Royle তাঁর Lectures on the Arts & Manufactures India 1852 -র এক জায়গায় লিখেছেন---

> A variety of specimens of carving in ivory have been sent from different parts of India and are much to be admired whether for the size or the minuteness, for the elaborateness of detail, or for the truth of representation.
>
> Among these the ivory-carvers of Berhampur are conspicuous....
>
> The set of chessmen carved were excellent representations... the representation of the elephant and other animals are so true to nature, that they may be considered the works of real artists.....

কাশিমবাজারে রেশমকুঠির সময়ে হাতির দাঁতের শিল্পের দেশে ও বিদেশে প্রসার লাভ করেছিল।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে যখন মুর্শিদাবাদের গৌরব প্রায় অস্তমিত, তখনও তার হাতির দাঁতের কাজ বিশ্বের সুধীজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে।

মুর্শিদাবাদের কারিগরেরা দেবদেবীর মূর্তি, নানা-রকমের জীবজন্তু তৈরী করে, যথা—হাতি, ঘোড়া, মহিষ, গরু, কুকুর, উট, হরিণ, কুমীর, নানারকমের লাঙ্গল কাঁধে চাষী, ধোপা, পুরোহিত, কুলি, রজক, দরজি, সিপাই, ফকির—নারী-মূর্তি, চুড়ি, বালা, কাস্‌কেট, ফটো-ফ্রেম, বেড়াবার ছড়ি, চিরুণী, কাগজ-কাটা।

কারিগরেরা যে কোন চিত্র দেখে যে কোন মূর্তি হাতির দাঁতে খোদাই করতে পারে—কিন্তু সচরাচর কেনার জন্যে সবরকমের জিনিষের খোঁজ করলে হয়ত পাওয়া যাবে না। চুড়ি, বালা, চিরুণী, প্রভৃতি অনেক সময়ে বিক্রীর জন্যে বাজারে মজুত থাকে।

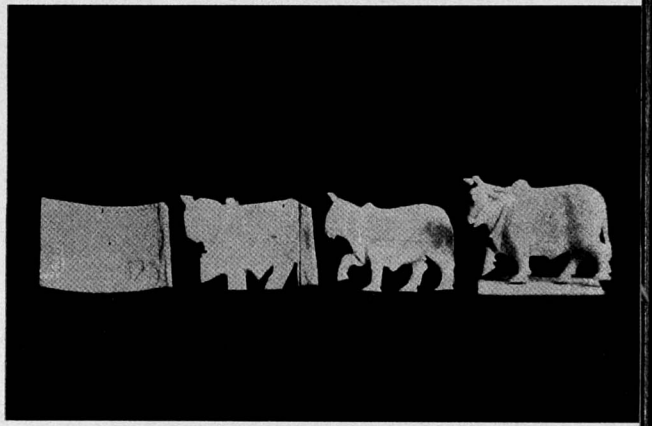

হাতির দাঁত খোদাই-কাজের প্রথম অবস্থা।

বাংলার হাতির দাঁতের দুর্গামূর্তি।

হাতির দাঁতের শিল্প সৌখীন নবাব ও জমিদারদের রুচি ও পৃষ্ঠপোষকতায় একদিন প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেয়েছিল—বাংলা বিহার উড়িষ্যার ধনী জমিদারবর্গ কারিগরদের বৃত্তি দিয়ে এতদিন ভরণপোষণ করে এসেছেন। দ্বারভাঙ্গা, ত্রিপুরা, কুচবিহারের মহারাজা-দের আশ্রয়ে এমন অনেক কারিগর থাকত যারা মহারাজার হাতিশালার হাতির দাঁত দিয়ে নানা রকমের সুন্দর সৌখীন জিনিষ তৈরী করত।

পাশ্চাত্ত্য জগতে হাতির দাঁতের তৈরী জিনিষ চিরদিনই মর্যাদা পেয়ে এসেছে। এই একটি শিল্প যা ভারতের একান্ত নিজস্ব, বিশেষ করে বাংলার সৃষ্টি ও কারিগরী-নৈপুণ্যের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন, যাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আমরা এখনও যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছি বলে মনে হয় না।

সমষ্টির রুচিকে শিক্ষিত করতে হবে, জিনিষের মূল্য সুলভ করে সকলের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনতে হবে, বিদেশের বাজারে প্রচুর মাল রপ্তানি করতে

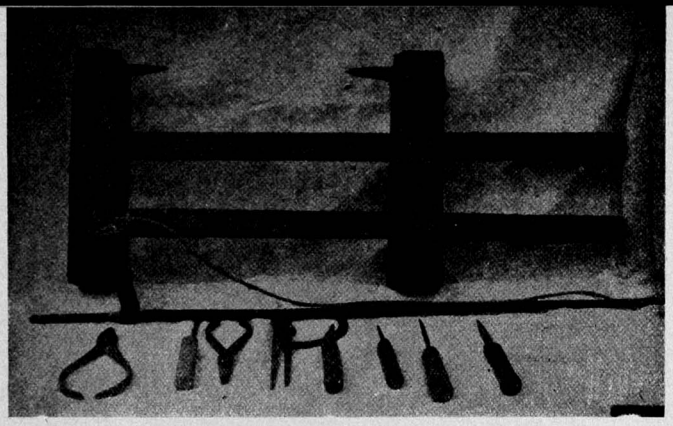

হাতির দাঁত খোদাইয়ের জন্য হাতিয়ার।

হবে। নানারকমের নতুন জিনিষ পুতুল, মূর্তি ভারতের চিত্রজগত থেকে আহরণ করে কারিগরের রেখায় রূপায়িত করে প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিশ্বজগতে ছড়িয়ে দিতে হবে।

বিদেশে বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের এই নিজস্ব দানকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সচেষ্ট হতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছেন। জানা গেছে মুর্শিদাবাদের কারিগরেরা সরকারের নির্দেশমত জিনিষ তৈরী করবে এবং সরকার তা কিনে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবেন। সুবিধা দরে কাঁচা মাল আমদানী করাও একান্ত আবশ্যক। সরকারের সুপরিচালনায় আশা করি সেটাও সম্ভব হবে।

হাতির দাঁত খোদাইয়ের হাতিয়ারের আর একটি ছবি।

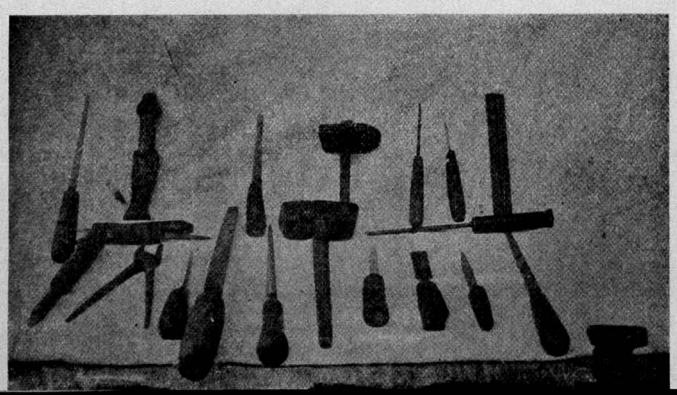

চলচ্চিত্রের শিল্প তত্ত্বের সন্ধানে

অসীম সোম

শিল্পের গোড়ার কথা হচ্ছে সৃষ্টির ভাব, মনন ও বস্তু-উপাদানের রূপায়ন। অন্তঃচেতনার রূপারোপে সৃষ্টা সন্ধান করেন বিভিন্ন সরণীর। উপায়নের মাধ্যম হিসেবে তাই দেখা দেয় কাব্য, উপন্যাস, সংগীত, নাটক, চিত্র, ভাস্কর্য প্রভৃতি। শিল্পীর কল্পনা এ সব সড়ক বেয়েই অপরের কাছে উদ্ভাসিত হয়। শিল্পের আত্মা যেন শরীর গ্রহণ ক'রে রূপরসের আলোড়ন আনে পাঠক বা দর্শকের অন্তরে। এভাবে 'একের' মানস-কন্যা অঘটন-ঘটন-পটিয়সী রূপে 'বহুর' চিত্ত-বল্লভার আসন পায়।

বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতিকে জয় করা, আর শিল্পের সাহায্যে নিজেকে ব্যক্ত করা--এক কথায় বলতে গেলে এ নিয়েই মানুষ বড় হয়েছে, বয়স বেড়েছে পৃথিবীর। নিজেকে ব্যক্ত করার উপায় হিসেবে সাহিত্য, সংগীত, ভাস্কর্য ইত্যাদি মানুষের আয়ত্তে ছিল স্মরণাতীত কাল থেকে। শিল্পমাধ্যম কিংবা 'ফর্ম অফ্ এক্সপ্রেশান' রূপে মানবসভ্যতার সর্বশেষ সংযোজন চলচ্চিত্রশিল্প। জগতের যাবতীয় শিল্পকর্ম প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে 'লার্ণিং অফ্ দি পিপ্‌ল' হিসেবে। 'ইন্‌আর্টিকিউলেট' মানুষের ভাব-ভাবনা-কল্পনা থেকে জন্ম নিয়েছে কাব্য-সাহিত্য, শিল্পসংগীতের অঙ্কুর। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান শুধু তার সহায় হয়েছে। ব্যাপ্তিতে ও বিকাশে, প্রচারে ও প্রসারে শিল্পকে বিজ্ঞান চৌদুনে চালিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু চলচ্চিত্র এমনি এক শিল্প যার ভিত বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক সত্যের ওপর, যান্ত্রিক ভিত্তির ওপর চলচ্চিত্রের আটের ইমারত গড়ে উঠেছে। সেদিক থেকে চলচ্চিত্র সম্পূর্ণ নতুন, ও স্বাধীন এক শিল্প-মাধ্যম বা আর্টফর্ম।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে কোন তত্ত্বানুসন্ধান করতে গেলে এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচারই বাঞ্ছনীয়--হয়তো প্রায় অপরিহার্য। আমাদের প্রাচীন শিল্পগুলির কালক্রমে একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, আর তা থেকে তৈরী হয়েছে এগুলির সৌন্দর্যতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্ব, --তাদের গুণাগুণ বিচারের মাপকাঠি। প্রত্যেক শিল্পেরই নিজস্ব একটা ষ্টাইল বা রীতি আছে। ষ্টাই-লাইজেশনের বৈশিষ্ট্য ছাড়া কোন শিল্পের স্বীয়তা, কিংবা ষ্টাইল গড়ে উঠতে পারে না। আবার ফর্মের দিক থেকে প্রত্যেক শিল্পেরই একটা অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা আছে। চিত্রকরকে ত্রি-স্তর বস্তু-জগতের রূপ প্রকাশ করতে হয় 'ফ্ল্যাট ক্যানভাস'-এর ওপর। কবিকে শব্দ-ছন্দ-অলঙ্কার রীতি-নীতি-গুলিকে মেনেই এগোতে হয় কল্পলোকে। অভি-নয়কাল ও মঞ্চসজ্জার ওপরে নজর রেখেই নাট্য-কারকে নাটক সাজাতে হয়। এ-হেন সীমাবদ্ধতা সিনেমা-জগতেও সমানভাবে বিদ্যমান। সেলুলয়েডে তোলা অসংখ্য চলমান দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র-নির্মাতাকে কোন ঘটনা বা আখ্যায়িকাকে দর্শকের কাছে তুলে ধরতে হয়। যে মাধ্যমেই হোক, তার স্বাভাবিক নিগড়কে মেনেই যে শিল্পপ্রমূতি সৃষ্টি করলেন শিল্পী, তাতে তিনি প্রাণসঞ্চার করতে পেরে ছেন কিনা, সেখানেই তার মূল্যায়ন। বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু পরিবেশনে শিল্পীর সার্থকতা। রূপসাগরে শিল্পীকে ডুব দিতে হয় অরূপরতনের আশায়, সীমার মাঝেই সন্ধান দিতে হয় অসীমের। এই নিয়মের রাজত্বেই তাঁর ক্ষমতার পরীক্ষা, প্রতিভার বিকাশ।

ফিল্ম সর্বৈবভাবে চোখ দিয়ে দেখার। 'ভিস্যুয়াল আর্ট' বলে অন্যান্য দৃশ্যগ্রাহ্য শিল্পকর্মের সঙ্গে এর আত্মী-য়তা, প্লাস্টিক আর্ট-এর গোষ্ঠীগত পরিচয়টীকা। একটির পর একটি সিকোয়েন্সে, ছবির পর ছবি সাজা-নোর ফলে পর্দায় বস্তুস্বরূপের বহিঃপ্রকাশ। দৃশ্য-গ্রাহ্য চিত্রকল্পের উপলব্ধিতে ছায়াছবির অন্তর্নিহিত রূপ ব্যক্ত হয়। ''ফিল্ম টেক্‌নিক'' বইএর এক জায়গায় পুডোভ্‌কিন বলেছেন—

"The novelist expresses his key stones in written descriptions, the dramatist by rough dialogue, but the scenarist must think in plastic (externally expressive) images. He must train his imagination, he must develop the habit of representing to himself whatever comes into his head in the form of a sequence of images upon the screen."

চিত্র, কিন্তু তা বলে স্থির নয়, গতিশীল। গতি আছে বলেই তো সিনেমা 'চলচ্চিত্র', মোশান পিক্চার বা 'মুভিজ'। আমাদের চোখের পার্সিসটেন্স অফ ভিসান-এর বৈজ্ঞানিক সত্যের আশ্রয়ে ফিল্মের গতি নিয়ন্ত্রিত। অন্যান্য প্লাস্টিক আর্ট-এর সঙ্গে এর পার্থক্য এই গতির জন্যই। চিত্রনাট্যকার পর্দায় প্রয়োগের দিকে নজর রেখে বিষয়বস্তুকে অসংখ্য খণ্ড দৃশ্যপটে রূপান্তরিত করেন। চিত্রশিল্পীর রং-রেখায় পারিপার্শ্বিক ব্যক্তিমানসের আধারে ধরা দেয়। চলচ্চিত্র-নির্মাতার কাছে জাগতিক রূপের বস্তু আধারে বিকাশ। চারুকলা বা স্থাপত্যের বীজমন্ত্র সিম্বিসিস, ছায়াছবির চাবিকাঠি এনালিসিস। অবশ্য সর্বত্রই শিল্পী তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভাবকল্পনা ও প্রকাশরীতির সামঞ্জস্য করে নেন।

চলচ্চিত্রশিল্পী বিষয়বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ থেকেও বিশেষ কোন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয় রূপকল্পের সন্ধান করেন। চিত্রশিল্পী দৃশ্যকে মনের চোখে দেখে তাকে এক সংহত রূপ দেন—তার দৃষ্টিভঙ্গী তাই মূলত সংশ্লেষণাত্মক। চলচ্চিত্র-নির্মাতা তাঁর বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ ক'রে দৃশ্য পরিকল্পনা করেন, বহু দৃশ্যের সমন্বয়ে এক অখণ্ড রূপসত্তা দর্শক চোখে তুলে ধরেন। ফলশ্রুতি হিসেবে অতিরিক্ত 'সামথিং প্লাস'-এর প্রকাশ এই প্রণালীতেই, ফিল্মের পরিভাষায় যার নাম 'মন্‌টাজ'। আইজেন্‌ষ্টাইনকে স্মরণ ক'রে বলতে হয়—

"The first task is the creative breaking-up of the theme, into determining representations, and then combining these representations with the purpose of bringing to life the initiating images of the theme. And the process whereby this image is perceived is identical with the original experiencing of the theme of the image's content. Just as inseparable from this intense and genuine experience is the work of the director in writing his shooting script. This is the only way that suggests to him those decisive representations through which the whole image of his theme will flash into creative being."

সিনেমার অনেক কিছু যান্ত্রিক কলাকৌশলের ওপর নির্ভরশীল—একথা আগেই বলেছি। শুধু তাই নয় যান্ত্রিক কলাকৌশলের ওপর নির্ভর ক'রে শিল্পসৃষ্টিতে এগোতে হয় বলে চিত্র-পরিচালককে সে অনুযায়ী কম্পোজিশন করতে হয়। ক্যামেরার চোখের সম্ভাব্য দৃষ্টিকোণ থেকেই এখানে বিষয়বস্তুর বিন্যাস। আঙ্গিক-বিন্যাস, রূপক-প্রতীক, সব কিছুই ক্যামেরার চোখে। চলচ্চিত্র-নির্মাতার প্রয়োগশৈলী এমনিভাবে যাকে ভিত্তি করে ব'লে, তার প্রেরণা যন্ত্রের সড়ক বেয়েই প্রকাশিত। একটা তুলনা দিলে বোধ হয় বিষয়টা পরিষ্কার হবে। ভাস্করের হাতে হাতুড়ি বাটালি, আর তাঁর মিডিয়াম হল পাথর, চিত্রকরের হাতে রং-তুলি, আর তাঁর মিডিয়াম ক্যান্‌ভাস। তেমনি চলচ্চিত্র-নির্মাতার হাতে ক্যামেরা, আর তার মিডিয়াম আলো। আলো-আঁধারের খেলার মধ্যে তিনি বস্তুর রূপ তুলে ধরেন, দেখান জীবনকে, জগৎকে—তার সব বৈচিত্র্য আর বর্ণাঢ্যতা নিয়ে। শব্দযোজনা এ শিল্পের সম্ভাবনা বাড়িয়েছে, তাকে আরো রিয়্যাল করেছে, ব্যবহারিক জীবনের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

আমরা দেখলাম কীভাবে চলচ্চিত্র ভিস্যুয়াল আর্ট হ'য়ে গড়ে ওঠে, কীভাবে সে স্বকীয় বিশেষ এক ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে, যাকে আইজেনষ্টাইন বলেছেন ফিল্‌ম্ ল্যাঙ্গোয়েজ। এই ভাষার ব্যাকরণ আলাদা, আলাদা এর অলংকারশাস্ত্র। এ সবের সমন্বয়ে যে শিল্পপ্রমূর্তি আমাদের কাছে জীবন্ত ব'লে প্রতিভাত হয়, তার প্রাণ হল গতি বা মুভ্‌মেন্ট। ভাস্কর্যকে আমরা জানি আর্ট অফ স্পেস হিসেবে; সংগীত আর্ট অফ টাইম। সেদিক থেকে চলচ্চিত্র আর্ট অফ টাইম এণ্ড স্পেস। রূপ ও গতির সম্মিলনেই সম্ভব হয়েছে চলচ্চিত্র শিল্পের।

গতি এবং রূপের সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়েই শিল্পের অসংখ্য অবয়ব সৃষ্টি সম্ভব। চলচ্চিত্রে তা ঘটেছে মোটামুটি তিনদিক থেকে, (১) ক্যামেরার গতি, (২) আলোর গতি ও (৩) ক্যামেরার

অবজেক্টের গতি। এ গতিতত্ত্বকে আমরা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে পরে বিচার করবো। সবাক চিত্র আবিষ্কারের পর ধ্বনি হয়েছে, এই তিনের সহায়ক। ধ্বনি শুধু ছায়াছবিকে অতিরিক্ত জীবনাশ্রয়ী ও বাস্তবানুগ হ'তে সাহায্য করে না, এর ব্যঞ্জনা দৃশ্যবস্তু থেকে বিষয়ান্তরে দর্শককে আকর্ষণ করতে পারে। সবাক-চিত্রের বেলায় দর্শনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে শ্রবণেন্দ্রিয় শিল্প-রসাস্বাদনের অঙ্গ হল। রূপের মধ্যে বাণী সম্পৃক্ত হ'য়ে যা ছিল শুধু 'দৃশ্য' তা 'শ্রব্য'ও হল।

মোবিলিটি ও প্লাস্টিসিটির যে সমন্বয়ে চলচ্চিত্রের সংহত শিল্পসৃষ্টির উন্মেষ করেছি, তা ধ্বনি সংযোগে ব্যাহত হয় বলে অনেক চলচ্চিত্রনির্মাতা ও বিশেষজ্ঞ মনে করেন। দেখা ও শোনাতে সামঞ্জস্য ঘটানোই সমস্যা। মনোযোগ দিয়ে সংলাপ শুনতে গেলে ছবি দেখার বাধা সৃষ্টি হয় কিছুটা। হার্বার্ট রীড তো বলেন,

"Speech must keep time with the film, but the normal film annihilates time. Therefore it must annihilate speech."

চলচ্চিত্রে সবাক যুগ আসাতে নতুন এক আর্টফর্মের উদ্ভাবন না হ'লেও ধ্বনিপ্রয়োগের সমস্যা একটা আছে। ফিল্মের কাহিনীর কুশীলবদের অতিরিক্ত সংলাপে রস ক্ষুণ্ণ হয়, একথা বলাই বাহুল্য। এখানে দৃষ্টান্তের আশ্রয় নিলে খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রায় সমস্ত ভারতীয় ছবিই এ দোষে দুষ্ট। তবে সংলাপ এক জিনিষ আর ধ্বনির 'এফেক্ট' হিসেবে প্রয়োগ আরেক জিনিষ। মুখের কথা দিয়েও যে বিশেষ 'এফেক্ট' আনা যায়, তার প্রমাণ বিদেশী ছবিতে মিলবে অনেক। 'পথের পাঁচালী'তে বাচ্চা বা ধ্বনির এমনি এক বিশেষ 'এফেক্ট'। সেখানে তো অনেক সময় পর্দার ফ্রেমের দৃশ্যবস্তুর বাইরের স্পন্দন এনেছে। সেখানে উক্তের চাইতে অনুক্তের ভাগ বেশী, শব্দের চাইতে অর্থের, বাচ্যের চাইতে ব্যঞ্জনার। এইটিই সত্যজিৎ রায়ের ধ্বনি ব্যবহারের সার্থকতা, তাঁর কৃতিত্ব। প্রাচীন ভারতীয় নন্দনশাস্ত্রের 'ব্যঙ্গার্থকে এখানে ব্যবহার করে বলা যায়, চলচ্চিত্রে শব্দের সেখানেই উৎকর্ষ যেখানে ধ্বনির প্রয়োগ ব্যঞ্জনাত্মক, বাক্যের প্রয়োগ ব্যঙ্গার্থক। ফিল্মে আবহসঙ্গীত বা কণ্ঠসংগীতের ব্যবহারের সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। কোন ছায়াছবির মুড, টোন বা বিশেষ কোন ঘটনাকে পরিস্ফুট করতে সুর সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হবে—যেমনভাবে এড্‌মাণ্ড মাইজেলের সুর সৃষ্টিকে আইজেনষ্টাইন ব্যবহার করেছেন 'ব্যাটেল্‌শিপ্ পোটেম্‌কিন'-এ বা রবিশংকরের সুরসৃষ্টিকে সত্যজিৎ রায় ব্যবহার করেছেন 'পথের পাঁচালী'তে।

সিনেমায় শিল্পসৃষ্টির ফর্ম কী, সেটাও লক্ষণীয়। নাটকে স্টেজের এক ফর্মের মধ্য দিয়ে তার স্বরূপ-লক্ষণকে দর্শক বুঝে নেয়। দর্শকের সঙ্গে নাটকের পাত্র-পাত্রীর দূরত্বটা সর্বদা মোটামুটি এক। সেখানে ফর্ম অবশ্যই 'ক্লোজ', সেদিক থেকে দেখলে চলচ্চিত্রের ফর্ম 'ওপেন'। মোটামুটি চারটি কারণে চলচ্চিত্রের এই বৈশিষ্ট্য, যেমন (১) একই পর্দার মধ্যে প্রতিফলিত ছবির দৃশ্যের সঙ্গে দর্শকের দূরত্ব বিভিন্ন ও সর্বদা পরিবর্তমান, (২) কোন একটি দৃশ্যের বহু সেক্‌সনে বা শটে বিভাজন, (৩) একই দৃশ্যের মধ্যে ক্যামেরার এঙ্গেল পরিবর্তন অর্থাৎ দৃষ্টিকোণ বা পার্সপেক্‌টিভ-এর পরিবর্তন, এবং (৪) 'মন্‌টাজ', যাকে বিশ্লেষণ করে কেউ বলেছেন 'মেকানাইজড ইমেজিনেশন' কেউ বা বলেছেন 'এ্যাসেম্‌ব্লী অফ শটস্'। বিভিন্ন শট্ প্রয়োজন অনুযায়ী সাজিয়ে সাজিয়ে, তাদের মধ্যে সংঘর্ষের কনফ্লিক্‌ট্ সৃষ্টির ফলে সম্পাদনার কলাকৌশল রূপ পায়। সম্পাদনায় ভাব ও কল্পনার প্রকৃতি ও বিস্তৃতি অনুসারে মন্টাজেরও রকমফের আছে, যেমন মেটাফোরিক্যাল মন্টাজ, পোয়েটিক মন্টাজ, এ্যালেগোরিক মন্টাজ। পুডোভ্‌কিন তাঁর 'মাদার' ছবিতে শ্রমিকদের মিছিলের দৃশ্যাবলীর সঙ্গে বসন্তকালের বরফগলা নদীর দৃশ্যাবলীকে যেভাবে সাজিয়েছিলেন, মিছিলের মুখের ছবির মধ্যে নদীজলের নাচের তুলনার আয়নায় ফেলেছেন, তাতে পোয়েটিক মন্টাজ-এর সৃষ্টি হয়েছে। মোটামুটি চারটি সূত্রের মধ্যে সাধারণভাবে মন্টাজকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন আর্নহিম্। তাঁর মতে মন্টাজ (১) ছবিকে 'কাট্' করার পদ্ধতি-সাপেক্ষ (২) টাইম সাপেক্ষ, (৩) স্পেস্ সাপেক্ষ, (৪) উপাদানের সম্পর্ক-সাপেক্ষ। ক্লোজ শট্, লংশট্ ইত্যাদি সারিবদ্ধভাবে সাজানোর ফলে যে রিদিম, তার সঙ্গে প্রথমটি জড়িত। দ্বিতীয়টির সম্পর্ক হল সময়ের সামঞ্জস্যবিধান, সমকালীনভাবে কিছু দেখানো, যেমন স্মৃতিমন্থন, মানসপটে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রভৃতি। তৃতীয় সূত্রের

প্রসঙ্গে বলা চলে একইভাবে সমসাময়িক ঘটনাবলীকে এক দৃশ্যপটে প্রক্ষেপন। চতুর্থটির সাহায্যে বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলা যায়, সমান্তরাল বা দ্বান্দ্বিক এফেক্ট বা দু'য়ের একীকরণের সাহায্যে। চলচ্চিত্রের ওপেন ফর্ম আরও বিস্তৃতিলাভ করেছে নানাধরনের পর্দার ও শব্দধ্বনির আমদানীতে। আগে শুধু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ছবি, এখন তাতে গভীরতা বা বেধ তৃতীয় স্তর বা ডাইমেনশন্ হিসেবে যোগ করা হয়েছে। এছাড়া আছে ওয়াইড-স্ক্রীন পানোরামিক-স্ক্রীন সিনেমাস্কোপ, প্রভৃতি। স্টেরিওফোনিক শব্দক্ষেপে ধ্বনির দূরত্ব প্রকাশের ফলে সিনেমা মেক-বিলিভ-এর জগৎ থেকে ন্যাচারালিজম্-এর জগতে আরেক ধাপ এগিয়ে এসেছে।

'মনটাজ' প্রসঙ্গে যে দ্বন্দ্ব, সংঘাতের উল্লেখ করেছি, সিনেমা-আঙ্গিক তার ওপরেই নির্ভরশীল। এই কনফ্লিক্ট-এর ভিত্তিতে সিনেমা-আঙ্গিক কিভাবে গড়ে ওঠে, তার কিছু কিছু আলোচনা মুভমেন্ট-এর প্রসঙ্গে করেছি। আইজেনস্টাইনের মতে,

> "In the realm of art the dialectic principle of dynamics embodied in conflict is the fundamental principle for the existence of every art and every form."

শটের পর শট সাজানোর বিরোধের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রনির্মাতা দর্শকমনে একটা ইমোশনের সৃষ্টি করেন। 'পথের পাঁচালী'তে ঝড় ও দুর্গার রোগশয্যার দৃশ্য এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সাদা-কালো বা আলো-ছায়ার সংঘাতের ফলে বিশেষ মুড খুঁজে পাওয়া যায়, মনের পর্দায় একটা বিশেষ ছবি ভেসে ওঠে। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ ক'রে বলা যায়, এই টোনাল কনফ্লিক্ট-এর ফল দেখা গেছে 'পথের পাঁচালী'র অনেক দৃশ্যে, যেমন অপু-দুর্গাকে ইন্দির-ঠাকরুণের রাক্ষসীর দেশের গল্প বলার অবিস্মরণীয় দৃশ্যে।

পার্সিসটেন্স অফ ভিসান-এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর সিনেমার বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে—একথা আগেই বলেছি। ছবির যে গতি সে তো দর্শকের মনে নড়ার একটা আইডিয়ামাত্র। সেকেণ্ডে ২৪ খানা স্থিরচিত্র পর্দায় ফুটে ওঠে।

পারসিসটেন্স অফ ভিসন-এর জন্য দর্শকের চোখে প্রতিটি স্থিরচিত্রের পরের অন্ধকারটুকু অদৃশ্য থাকে। পরিবর্তে দর্শক অনুভব করে একটা গতি বা মোশান অসংখ্য ষ্টিল ফ্রেম-এর সংঘাত বা কনফ্লিক্ট-এর ফলে গতির এই আইডিয়া। ডায়ালেক্‌টিক্‌সের দৃষ্টি-কোণ থেকে এমনিভাবে চলচ্চিত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকেই ব্যাখ্যা করা চলে।

একান্তভাবে আধুনিক ও যন্ত্রযুগজাত বলে, এর জন্মলগ্নে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল, শ্রেণী-গোত্র নিয়ে বিরোধ ছিল রসিকসমাজে। নানা বৈজ্ঞানিক বা কারিগরী কুশলতার ওপরে এর বিকাশ নির্ভরশীল হওয়াতে, সার্থক শিল্পীমন এখানে বিচরণ করতে পারে না, কোন শিল্প-প্রতিভা একে নিয়ে চর্চ্চা করতে পারে না, এমন একটা মত যে চালু ছিল না তা নয়। কিন্তু শিল্পতত্ত্বের মূলকথা সিলেকশান এখানেও সমান কার্যকরী ও সমান প্রয়োগসাপেক্ষ। সিলেকশান-এর ভিতর দিয়েই সিনেমার সৃষ্টি-সৌকর্য ও মাননির্ণয়। এ-কথাই সূচিত করে চলচ্চিত্র মূলত একটা আর্টফর্ম। বহুজনের যান্ত্রিক কুশলতার সঙ্গে এক সংহত শিল্পদৃষ্টি সম্পৃক্ত হ'য়ে প্রকাশের নতুন ফর্ম - ল্যাঙ্গোয়েজ - এর সৃষ্টি। চলচ্চিত্রের পরিচিতি তাই কম্পোজিট আর্ট শিল্পের এই জগতে সার্থক স্রষ্টা বেশী আসেননি এ-কথা সত্যি। একজন শেক্সপীয়ার বা রবীন্দ্রনাথ এখনও এ-শিল্পমাধ্যমে আবির্ভূত হননি। অপটু, অক্ষম অমার্জিত, লোকের আর্টচর্চা চলচ্চিত্রের মত অন্য কোন শিল্পজগতে এত বেশী হয় না। তাই অযৌক্তিক অশৈল্পিক ও অশালীন ছবিতে এর প্রাঙ্গণ ভরে গেছে। আর চলচিচত্রের ব্যবসায়িক দিকটা প্রকট। সম্ভবত এই তিনটি কারণেই বনেদী শিল্প-রসিকের দরবারে চলচিচত্র-শিল্প কৌলীন্য নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু তবু বলবো, এ সবেরই পিছনে কিছুটা উন্নাসিকতা, কিছুটা অজ্ঞতা লুকিয়ে আছে। উৎকর্ষের চরমে সিনেমা এখনো পৌঁছয়নি সত্যি, তবু পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ এখনও অনেক। তবে এক বিশেষ শিল্পধারা হিসেবে এর বিষয়গৌরব ও প্রয়োগচারুতা দেখা গেছে বহুবার এবং এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ। যান্ত্রিক কলাকৌশলের চরমোৎকর্ষের শেষে হয়তো দেখা দেবে আর্ট হিসেবে চলচ্চিত্রের পূর্ণ বিকাশ। তাই চলচ্চিত্রের সৌন্দর্যতত্ত্বের গতি-প্রকৃতি এখনও পরিবর্তনশীল ও পরিণতির অপেক্ষা রাখে।

রবীন রায়ের শিল্প বৈচিত্র্য

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

নব নব উন্মেষশালিনী ক্ষমতার সংক্ষিপ্ত নাম প্রতিভা। এই ক্ষমতা সাধারণত একমুখী।

শিল্পী রবীন রায় কিন্তু এই অর্থে ব্যতিক্রম-বিশেষ। বৈচিত্র্য-সুন্দর বহুমুখী তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা। শিল্পের বিভিন্ন মার্গে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যদীপ্ত পদচারণা প্রশংসনীয়ভাবে লক্ষণীয়। চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, ফটোগ্রাফি থেকে শুরু ক'রে সাহিত্য, সাংবাদিকতা এমন কোন বিষয় নেই, যাতে তিনি তাঁর শিল্পীমনের স্বাক্ষর রাখেননি। এবং কয়েকটি বিষয়ে আশ্চর্যরকম দেশোত্তর ক্ষমতার পরিচয় দান করেছেন।

বোধ করি বাঁধা-ধরা ছক-কাটা কোন নিয়মতন্ত্রতার মধ্যে কোনদিন ছিলেন না বলেই এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। কোনো স্কুলে বা কোন শিল্পীর কাছে তিনি কোনদিন কোনো বিষয়েই শিক্ষানবীশি করেননি। অথচ চিত্রাঙ্কন বা ভাস্কর্যে তিনি শিক্ষিতপটুত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

ইংরেজি ১৯০৫ সালের আটাশে জুন সন্তোষের বিখ্যাত জমিদারবংশে রবীন রায় জন্মগ্রহণ করেন। এ-হেন ঐশ্বর্যের কোলে যাঁর জন্ম, তিনি উত্তরজীবনে আর কিছু না হোন, আইনসভার সদস্য বা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হয়তো হ'তে পারতেন, কিন্তু মনে-প্রাণে তিনি জাত শিল্পী; সহজাত তাঁর শিল্পপ্রতিভা। রাজৈশ্বর্য

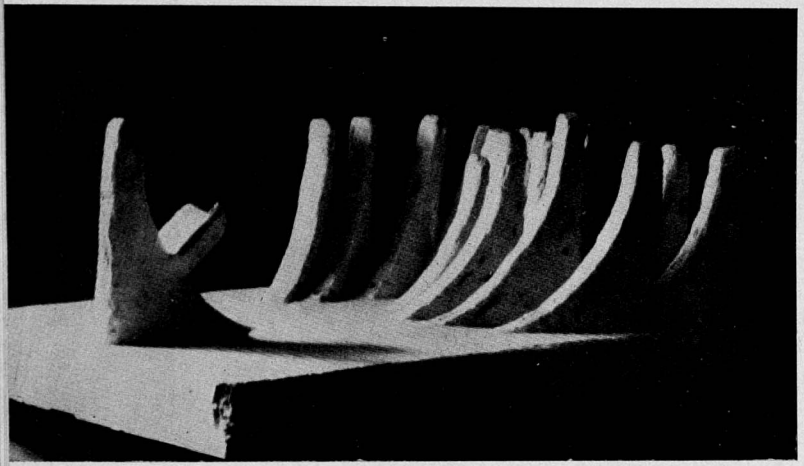

ভাস্কর্যে গান্ধীজীর প্রার্থনাসভা।

তুচ্ছ ক'রে তিনি গাছের ডালপালা, খড়-কুটো, কাটা চুল, তুচ্ছাতিতুচ্ছ অবহেলিত জিনিস দিয়ে গড়ে তুললেন বিরাট এক ঐশ্বর্যের জগত—শিল্পের পৃথিবী। প্রতিভা জন্মায়, তৈরি হয় না, এমন একটা উক্তি প্রচলিত আছে; বিত্ত-সম্পদের প্রাচুর্যে জন্যেও, নানা লোভনীয় আকর্ষণের মধ্যে লালিত হয়েও রবীন রায় শেষ পর্যন্ত শিল্পী হিসাবেই পরিচিতি লাভ করলেন, এটাই তার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হয়ে রইলো।

শিল্পজগতে রবীন রায়ের অনন্যতা শীলমোহরের গালা বা লাক্ষার ছবিতে, ইংরেজিতে যাকে বলে সীলিং ওয়াক্স পেন্টিং। এ-ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ তো বটেই, প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন। ১৯৩৮ সালে প্রথম তিনি শীলমোহরের গালা দিয়ে ছবি আঁকেন এবং বোম্বাইর শিল্পীমহলে তা নিয়ে আলোচনা হয়। সারা ভারতবর্ষের কলারসিক মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর এই অভিনব শিল্পকৃতিকে সেদিন অভিনন্দন জানিয়েছিল। গালার ছবি তিনি পরে আরো এঁকেছেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং বিভিন্ন স্থানে সে-সব ছবি ছাপা ও প্রদর্শিত হয়েছে। বলতে গেলে, ছবি আঁকার উপাদান হিসাবে রঙিন গালার ব্যবহার রবীনবাবু-ই প্রথম প্রবর্তন করেন। এই সমস্ত ছবি তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে স্বীকৃত।

গালার ছবি ছাড়া ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও রবীনবাবুর বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব লক্ষ করবার মতো। তাঁর ভাস্কর হবার পেছনে একটা মজার গল্প আছে। একবার এক বন্ধুর সঙ্গে ভাস্কর্য নিয়ে তাঁর এক দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলোচনা ক্রমে উত্তপ্ত বিতর্কে পরিণতি লাভ করে। বিতর্ক প্রসঙ্গে তাঁর বন্ধু হঠাৎ বলে ওঠেন, তোমার প্রতিভা যত বহুমুখী হোক, হাজার চেষ্টা করলেও তুমি ভাস্কর হিসেবে কোনোদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। আঘাত পেলেন রবীনবাবু। প্রতিজ্ঞা করলেন, যেমন ক'রেই হোক ভাস্কর তাঁকে হতেই হবে। আরেক ভাস্কর-বন্ধুর কাছে কয়েকদিনের জন্যে কিছু যন্ত্রপাতি ধার চাইলেন। খুশি হ'য়ে উৎসাহের সঙ্গে বন্ধু তা দিলেন। শুরু হলো সাধনা। সিদ্ধির সামীপ্য লাভ করলেন।

১৯৫২ সাল। পাথরের গায়ে প্রমূর্ত করলেন শান্তির প্রার্থনায় ধ্যান-তন্ময় 'দুঃখের জননী'র অসীম আকুতি,—নাম, 'মেটার ডলোরোসা' বা 'দুঃখের জননী'। যে বন্ধু তাঁকে যন্ত্রপাতি ধার দিয়েছিলেন, তিনি সপ্রশংস আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। তাঁরই বাটালির আঘাতে সৃষ্ট হয়েছে রবীনবাবুর অপূর্ব কাজটি। ভাস্কর হিসাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হলেন গালার ছবি-আঁকিয়ে রবীন রায়, আসরে নেমেই কিস্তি মাত করলেন।

এর পর আরো বহু মূর্তি গড়লেন, কিছু আবক্ষমূর্তি এবং প্রতিকৃতিও গড়লেন। এদের মধ্যে 'ঈভের অনুতাপ' (রিপেন্‌টেন্‌স অফ ঈভ), 'বন্দী প্রমিথিয়ুস' (প্রমিথিয়ুস বাউণ্ড) এবং 'সময়ের বিকৃতি' (ডিস্‌টর্শান অফ টাইম) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত কাজটি স্বকীয়তা ও অসাধারণত্বে আশ্চর্যসুন্দর। তাঁর এই সমস্ত কাজ যত দেখা যায় ততই মুগ্ধ হতে হয়, যত দেখা যায়, ততই তাদের সৌন্দর্য আস্তে আস্তে ধরা দিতে থাকে মর্মের গভীরে।

গাছের ডাল-পালা, খড়-কুটো, কাটা চুল প্রভৃতি বহু তুচ্ছ জিনিস দিয়েও রবীনবাবু চমৎকার সব শিল্প সৃষ্টি করেছেন। এ-বিষয়ে তিনি অবনীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী। এবং এই মিলের জন্যেই অবনীন্দ্রনাথ ভালোবাসতেন তাঁকে, টুকিটাকি জিনিসের সাহায্যে তৈরি আশ্চর্য শিল্প-কর্মসমূহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। ১৯৩০ সালে একটুকরো কাঠের ওপর আঠার সাহায্যে কাটা চুল দিয়ে একটি সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি তৈরি ক'রে শিল্পরসিকমহলে রীতিমতো সাড়া তোলেন। বোম্বাইর শিল্পীমহলে ঐ বছরেই এই ছবিটি বহুল আলোচিত হয়। ১৯৩৪-এ নাঙ্গা পর্বত আরোহণকারী জার্মাণ অভিযাত্রীদলের সকলেই যখন পাহাড়ের প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণ হারান, তখন বোম্বাইর একটি পত্রিকায় উক্ত বিপর্যয়ের কিছু ছবি প্রকাশিত হয়। ঐ ছবিগুলোর একটির বিশেষ একটা অংশ দাগ দিয়ে রবীনবাবু ঐ পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পাঠান। ঐ অংশটি ছবিতে বড় করে তোলা হলে (এনলার্জ করা হলে) দেখা যায়, একটা দৈত্য আরোহী-

শীতের দিনের গাছ (লাক্ষা চিত্র)।

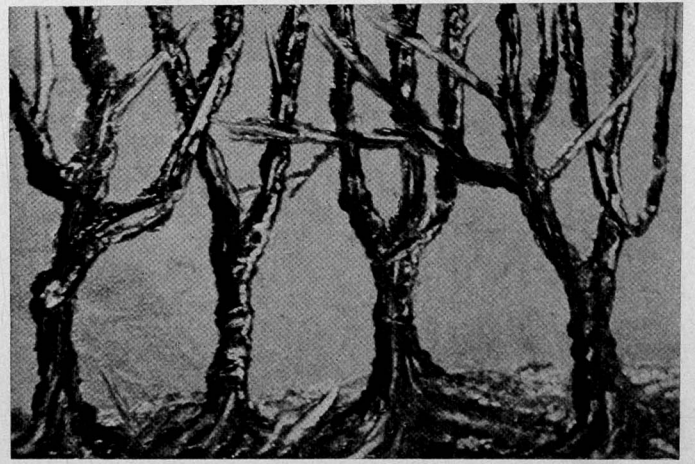

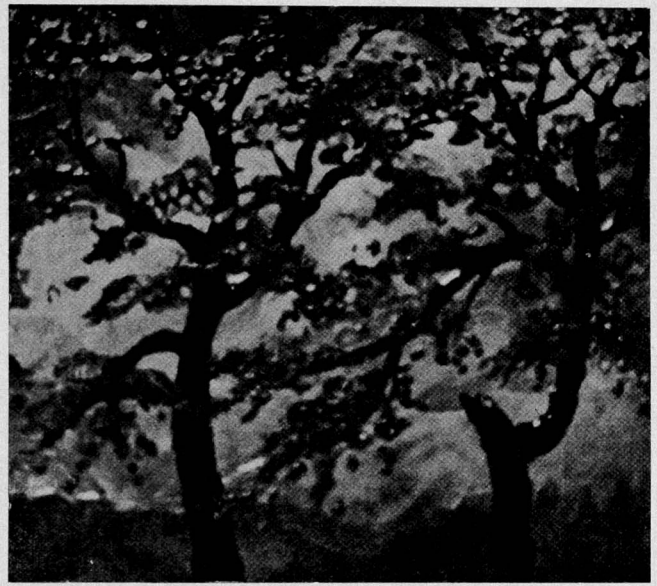

শরতের আকাশ (লাক্ষা চিত্র)।

দলের দিকে চেয়ে অবজ্ঞার ও ঘৃণার হাসি হাসছে। রবীনবাবু এই দৈত্যের নামকরণ করেছিলেন 'নাঙ্গা দৈত্য' বা নাঙ্গা শয়তান' (নাঙ্গা ডেভিল)। তাঁর ধারণায় এই নাঙ্গা শয়তানই আরোহীদলের প্রাণহরণ করেছিল। সামান্য ছবি, তার থেকে এই রূপপ্রমূর্তি আবিষ্কার সত্যিকারের শিল্পদৃষ্টি সূচিত করে। প্রমাণ করে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব।

গাছের ডালপালা নিয়ে রবীনবাবু যে-সব শিল্পসৃষ্টি করেছেন তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তাঁর মতে গাছের এমন অনেক ডালপালা আছে যা দিয়ে সুন্দর ভাস্কর্য হতে পারে। উপযোগী ডালপালা বাছাই করার শক্তি আর সেই সঙ্গে ধৈর্য থাকলেই হলো। সোজা বাঁকানো প্রশাখাবহুল নানা ধরনের ডালপালা বাছাই ক'রে ঠিকমতো কেটে-ছেঁটে নিয়ে মূর্তি বানাতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে সোজা মনে হয়, কিন্তু কল্পনাশক্তি সুদূরপ্রসারী ও প্রখর না হলে এ অসম্ভব। আর কল্পনাপ্রবণ রবীন রায় এ-বিষয়ে যে অসামান্যরকম পারঙ্গম, তা তাঁর এ-সব শিল্পকৃতিতে পরিস্ফুট। তাঁর মতে যা কিছু জাগতিক, তার প্রায় সবেতেই ভাস্কর্যের প্রভাব বর্তমান। ইচ্ছা করলে আর কল্পনা থাকলে যে কোন কিছু থেকেই, বা বলা যেতে পারে, যে কোন কিছু দিয়েই মূর্তি গ'ড়ে তোলা যায়। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গাছের ডালপালা

দিয়ে রবীনবাবু যেসব শিল্প সৃষ্টি করেছেন 'আসামের বনবিভাগ' শিলঙের 'ফরেষ্ট মিউজিয়ামে' তা সংরক্ষণ করে রেখেছেন।

পেন্সিল আর রং-তুলি দিয়ে স্কেচ করতে হয়, জানতাম। কিন্তু টাইপরাইটার দিয়েও যে স্কেচ করা যায়, তা একরূপ অভাবনীয়। যন্ত্রের রেখাতেও যে জীবনের ছন্দ ফুটিয়ে তোলা যায়, প্রথম না হলেও, তার চমৎকার একটি নিদর্শন উপস্থিত করেছিলেন রবীন রায়। ছবিটি ওয়াশিংটনে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

এ তো গেল হাতের কাজ। ফটোগ্রাফিতেও রবীন রায় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। একসময় তিনি ভারতবর্ষের একজন সেরা ফটোগ্রাফারের খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'ছ-হাতের দেবতা' (সিক্স-আর্মড্ ডিভিনিটি) তাঁর একটি নাম-করা ফটো। ছবিটি রোমে চলে যায় এবং ওখানে বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। রেভারেণ্ড এইচ, হেক ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার সময় উল্লেখ করেছিলেন ছবিটির। ওমর খৈয়ামের একটি কবিতাংশের ব্যাখ্যা ক'রে রবীনবাবু আরেকটি ছবি তুলেছিলেন। প্রখ্যাত পার্সি অধ্যাপক মাহ্ফুজ-উল-হক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন ছবিটির। রবীনবাবুকে প্রতিভা আখ্যা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ওমর খৈয়ামের এ-হেন একজন ব্যাখ্যাতা দুর্লভ শুধু নয়, রীতিমতো সুদুর্লভ। পারস্য, ইংল্যাণ্ড, অ্যামেরিকা, জার্মানী যেখানেই ছবিটি গেছে, অজস্র সুনাম কুড়িয়ে আনতে তা সমর্থ হয়েছে। ছবি তোলা ছাড়া ছবি তোলার ওপরেও প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। এ-রকম একটি প্রবন্ধ স্বনামধন্য জর্জ ইষ্টম্যান (কোডাকের) সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল।

শুধু রেখা নয়, লেখার ব্যাপারেও তিনি উৎসাহী ও অগ্রণী। নাম-করা সব পত্র-পত্রিকায় তাঁর ইংরেজি কবিতা ও প্রবন্ধ বেরিয়েছে। 'এ প্লী ফর ন্যাশানাল ইণ্ডাষ্ট্রী' নামে তাঁর একটি সুচিন্তিত যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ এক-

স্বাভাবিক গাছের ডালে তৈরী সারস।

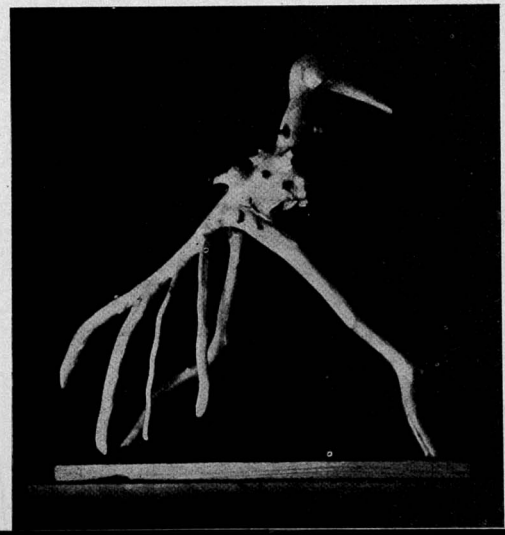

সময় সাড়া তুলেছিল কলাবসিকমহলে। কয়েক বছর সাংবাদিকতাও করেছেন তিনি এবং দুটি নাম-করা সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকার শিল্প-বিভাগ সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর বাগ্মিতাও কম উল্লেখযোগ্য নয়, শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সহজ সাবলীলভাবে চমৎকার বক্তৃতা করতে পারেন তিনি। বহু জায়গায় শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি প্রশংসনীয় বক্তৃতা দিয়েছেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে যে উৎসাহী ও সক্রিয় সমর্থন পাওয়া প্রয়োজন, বলা যায়, পাওয়া উচিত, তা তিনি পাননি কোনোদিন। 'জাতীয় শিল্পের পক্ষে যুক্তি' (এ প্লী ফর ন্যাশানাল ইণ্ডাষ্ট্রী) নামে একটি ওজস্বী প্রবন্ধ লিখে একসময় খুব নাম করেছিলেন শিল্পী-প্রাবন্ধিক হিসাবে। শিল্পানুরাগী জনসাধারণের একাংশের টনকও নড়েছিল এতে। কিন্তু

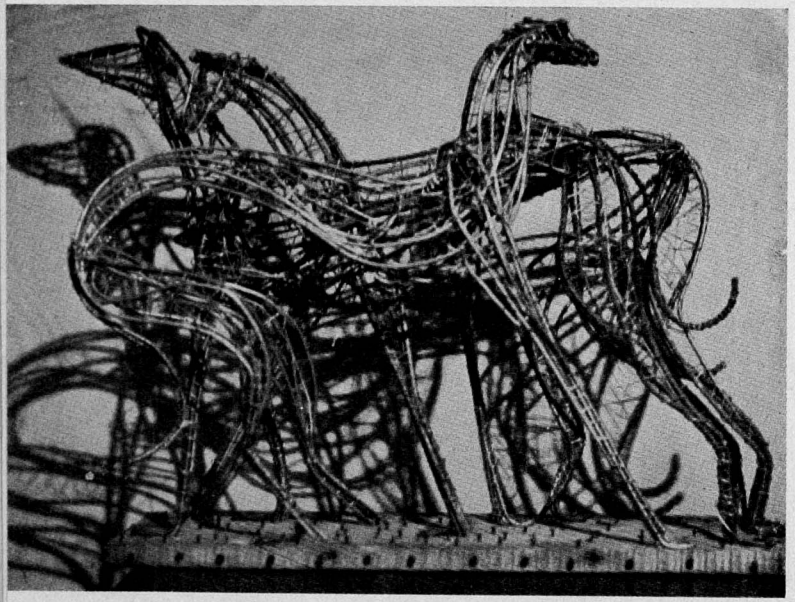

গ্রে-হাউণ্ড—তার দিয়ে তৈরী ভাস্কর্য।

আগেই বলেছি টুকিটাকি জিনিস নিয়ে শিল্প সৃষ্টি করতে রবীন রায়ের জুড়ি নেই। এই টুকিটাকি জিনিসের প্রয়োজনীয়তা তিনি হাতের কাজে প্রমাণ যেমন করেছেন, তেমনি সে-সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছেন এবং বক্তৃতা দিয়েছেন প্রচুর। একসময় তিনি শিল্পানুরাগী ব্যক্তিদের সপ্রশংস

যেই-কে-সেই, উপযুক্ত সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থন পাওয়া গেল না যথাসময়ে। ফলে তাঁর বক্তব্য মাঠে মারা গেল। স্যার জি, পি, হগ এবং বাংলাদেশের তদানীন্তন গভর্ণর আর, জি, কেসী প্রমুখ উৎসাহ দেখালেও তা যথেষ্ট ছিল না এবং সত্যিকথা বলতে কি তা খুব আন্তরিকও ছিল

একটি মুখ (ভাস্কর্য)।

না। বৃহত্তর জনসাধারণের সোৎসাহ সমর্থন ব্যতিরেকে শিল্পের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। জনসাধারণের মধ্যে শিল্পানুরাগ বাড়াবার জন্যে তাই তিনি সচেষ্ট হলেন। এবং স্কুল ও কলেজসমূহের এবং অন্যান্য সাধারণ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট স্থায়ী 'আর্ট গ্যালারী' ও 'ইন্-ডাষ্ট্রীয়াল মিউজিয়াম' নির্মাণের এক যুগযোগ্য পরিকল্পনা ও প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

স্বীয় শিল্পকীর্তির জন্যে রবীন রায় দেশ-বিদেশে শিরোপা-সম্মানও পেয়েছেন প্রচুর। আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসু, অবনীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রাধাকৃষ্ণন, সি, ভি, রমণ, অমরনাথ ঝা প্রমুখ মনীষীবৃন্দ অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়েছেন তাঁর শিল্পপ্রতিভাকে। ১৯৫২ সালে যে রাশিয়ান শিল্পীদল কলকাতায় এসেছিলেন, তাঁরা তাঁর 'মেটার ডলোরোসা' ও অন্যান্য ভাস্কর্যসমূহের এবং তাঁর চিত্রাবলীর সবিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। আর আগেই বলেছি, অবনীন্দ্রনাথের প্রশংসার কথা। টুকিটাকি জিনিস দিয়ে তাঁর তৈরী শিল্পকৃতি দেখে অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশেষ মৌলিকক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পী ব'লে অভিনন্দিত

করেছিলেন, এবং ঐ শিল্পকৃতিগুলোকে শিল্পজগতে তাঁর মৌলিক দান ব'লে স্বীকারও করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণণ এবং অমরনাথ ঝা যখন যথাক্রমে বেনারস ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন, তখন তাঁরা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দুটির আর্ট গ্যালারীর জন্য তাঁর কিছু কাজ নির্বাচিত করেছিলেন।

শিল্পক্ষেত্রে রবীন রায় যে এ-যুগের একজন অগ্রগণ্য 'ট্যালেন্ট' এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অনুপস্থিত। নব নব সৃষ্টিশীল ক্ষমতাকে যদি প্রতিভা বলতে হয়, তাহলে বলবো, রবীন রায়ের জুড়ি বাংলাদেশে বিরল। সীলিং ওয়াল পেন্টিং-এ তিনি পথিকৃৎ; টুকিটাকি জিনিস দিয়ে অবাক হবার মতো শিল্পসৃষ্টিতে তিনি অনন্য; ভাস্কর্যে তিনি ক্ষমতাশালী। বৈচিত্র্যে তাঁর সৃষ্টি বিকীর্ণ, সৃষ্টিতে বিলসিত বৈচিত্র্যের রং-রেখা। এককথায় রবীন রায়ের সমগ্র শিল্পসৃষ্টিতে জীবন এক মুক্তির ছন্দে আনন্দিত, আনন্দে মুখরিত। তাঁর প্রতিভা বহুধাচারী, কিন্তু প্রত্যেক ধারাই জোয়ারের ঐশ্বর্যে আশ্চর্যরকমের বিশিষ্ট।

স্বাভাবিক গাছের ডালে তৈরী মানুষ।

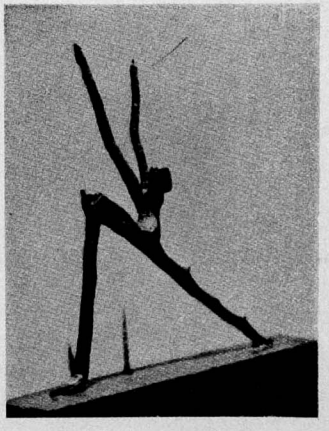

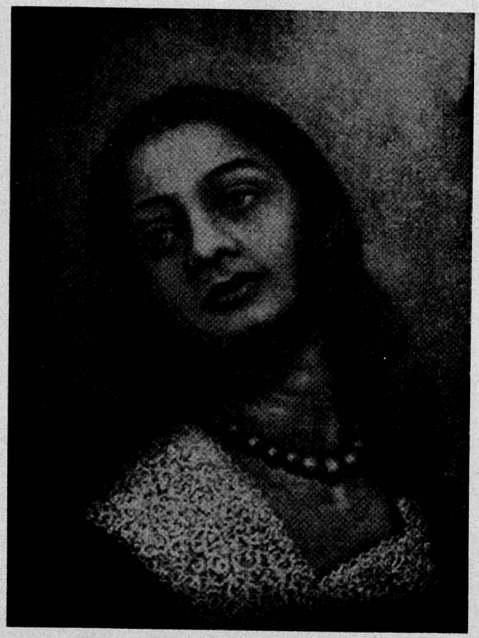

।। রবীন রায়ের পুরাতন ইতালীয় ঢং-এ আঁকা একটি তৈলচিত্র ।।

শিল্প কি ?

শিল্পীদের অবশ্যপাঠ্য বিধায় খুঃ আঠারশ ছিয়াশি অব্দে প্রকাশিত শিল্প সম্পর্কে একটি প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ।

মাল্যগ্রন্থন বিকল্প

.....এক্ষণে দেখা যাউক শিল্প কি ? শিল্পশাস্ত্র বলিলে কোন কোন বিষয় সেই সীমা মধ্যে পতিত হয় ? ইংরাজীতে যাহাকে Fine Arts বলে, যাহা অসমদ্দেশে পূর্ব্বে "সূক্ষ্ম শিল্প" ও এক্ষণে "সুকুমার কলা" শব্দে অনুবাদিত হয়, তাহা অসংখ্য হইলেও ইংরাজী অবিধানে, পদ্য-রচনা (Poetry), গীতশাস্ত্র (Music), চিত্রবিদ্যা (Painting), স্থাপত্য (Architecture) এবং ভাস্কর্য্য (Sculpture)-কে মাত্র ঐ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ প্রাচীন কালের, আরও অনেক প্রকার শিল্পকার্য্য পাশ্চাত্য এদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে যাহাই হউক, বৈদেশিক শব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা লইয়া ভাবিবার প্রয়োজন কি ? আমাদের প্রাচীন ভারতে শিল্পের কতদূর সীমা ছিল দেখা যাউক।

চতুঃষষ্টিকলা যে শিল্পশাস্ত্রের নামান্তর তাহা "সূচনাতে" বলা গিয়াছে। কিন্তু আমাদের মুখের কথা অপেক্ষা আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের বাক্য বোধ হয় অধিক প্রীতিকর হইবে, এই জন্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের লিখিত "বার্ত্তাশাস্ত্র বা জীবিকাতত্ত্ব" হইতে "শিল্প" শব্দের ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"শিল্প—শিল্প একটি বহু বিস্তৃত জীবিকা। ইহার শাখা-প্রশাখা যে কত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। নিত্য নূতন শিল্প প্রচারিত হইতে পারে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন জীবিকাশাস্ত্রে যে সকল শিল্পের উল্লেখ আছে তাহার কতক অংশ লুপ্ত হইয়াছে এবং তাহার অতিরিক্তও কতকগুলি নূতন শিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন কালে শিল্পকে "কলাবিদ্যা" বলিত। এই কলা বিদ্যা বা শিল্পবিজ্ঞান পূর্ব্বে ৬৪ চৌষট্টি প্রকার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।" ৬৪ প্রকার কি কি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

"১। গীত—গীত কি ? তাহা কাহারও অবিদিত নাই। গীতে কোন শিল্প সংযোগ আছে কিনা এবং

বিশেষকচ্ছেদ্য।

গীতশিল্পের দ্বারা লোকের অর্থোপার্জ্জন হয় কিনা—তাহা সকলেই জানেন, সুতরাং গীত বুঝাইবার জন্য শব্দান্তর প্রয়োগ করিতে হয় না।

"২। বাদ্য—বাদ্য গীতের সহচর, সুতরাং ইহাও প্রসিদ্ধ।

"৩। নৃত্য—নৃত্য কি? এবং নৃত্যে যে বিশেষ শিল্প আছে তাহাও অগোচরিত নহে।

"৪। নাট্য—নাটকের অভিনয়। ইহাতে বিশেষ শিল্প আছে। ইহার দ্বারা বড় মন্দ অর্থোপার্জ্জন হয় না। নাটক লেখা ও তাহার অভিনয় করা এক্ষণে অনেকেরই জীবিকা হইয়াছে। এটিকে স্বাধীন জীবিকা বলিলেও বলা যায়।

"৫। লেখ্য—চিত্রকার্য্যের নাম লেখ্য। লেখ্য ও চিত্রকার্য্য এক পর্য্যায়, চিত্রকার্য্য যে একটি বিশেষ শিল্প, তাহা সকলেই জানেন। ইহা অতি উত্তম জীবিকা, এই জীবিকাটি সম্পূর্ণ স্বাধীন।

"৬। বিশেষকচ্ছেদ্য—পূর্ব্বকালে এদেশের নরনারীগণ চন্দন ও কুঙ্কুমাদি দ্বারা শরীর চিত্রিত করিত। এই চিত্র রচনার (অলকা তিলকা প্রভৃতি) কৌশল বিশেষকে 'বিশেষকচ্ছেদ্য' বলিত। ইহা মালীর মেয়ে ও নাপ্তেনী প্রভৃতির জীবিকা ছিল। এক্ষণে লোক সভ্য হইয়াছে বলিয়া অলকা তিলকা পরে না ও কাজে-কাজেই উহা এক্ষণে জীবিকাপদবাচ্য নহে। কেবল নাপ্তেনীরা কখন কখন আলতা পরাইয়া দুই এক পয়সা পায় মাত্র। বিশেষকচ্ছেদ্য কি তাহা বুঝাইবার জন্য এক্ষণে একটি মাত্র নিদর্শন পাওয়া যায়। কলিকাতার ও কাশীর গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া, লোকে উড়ে ও হিন্দুস্থানী খাটিওয়ালার নিকট যে চন্দনের ছাপা পরিয়া আইসে তাহাই পূর্ব্বকালের বিশেষকচ্ছেদ্যের অপভ্রংশ বা অনুকরণ।

"৭। তণ্ডুল-কুসুম-বলিবিকার—পূজা কি যাগ যজ্ঞের সময় তণ্ডুলের নৈবেদ্য রচনা, পুষ্পের স্তবক রচনা, উপহার দ্রব্যের সংস্থান রচনা। পূর্ব্বকালের অকর্ম্মণ্য ব্রাহ্মণেরা এই কার্য্য করিত। এখন আর ইহা নাই, একেবারে লোপ পাইয়াছে।

"৮। পুষ্পাস্তরণ—ফুলের শয্যা ও ব্যজন প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা। মালীরা এই কার্য্য করিত। এখনও ফুলের স্তবক (তোরা), পাখা ও হার প্রভৃতি রচনা-করিয়া মালীরা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

"৯। দশনবসনাঙ্গরাগ—দন্তরঞ্জন, বস্ত্ররঞ্জন ও অঙ্গরঞ্জন। পূর্ব্বকালের লোকেরা দাঁতে নানা প্রকার ছক কাটিত, গাত্রে উল্‌কী পরিত, সে সকল এক্ষণে সভ্য সমাজ হইতে দূর হইয়াছে। বস্ত্ররঞ্জন ও অঙ্গ-রাগের মধ্যে আলতা পরা এই দুইটি কেবল বিলাসিনীরা অদ্যাপি বজায় রাখিয়াছেন। বস্ত্ররঞ্জকেরা বিলক্ষণ দশ টাকা পায়, কিন্তু অঙ্গরঞ্জনটি তাঁহারা প্রায় আপন আপনিই নির্ব্বাহ করেন।

"১০। মণিভূমিকর্ম্ম—মণি অর্থাৎ প্রস্তর। তদ্দ্বারা চত্বর, পিণ্ডিকা, প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করণ। ইহা একটি প্রধান শিল্প। ইহাতে পারগ হইতে পারিলে বিশিষ্টরূপ উপার্জ্জন হয়। এই জীবিকাটি বরং পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিক গৌরবের ও উপার্জ্জনের হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"১১। শয়নরচনা—খাট, পালঙ্ক, তক্তাপোষ প্রভৃতি শয়নীয় দ্রব্য নির্ম্মাণ করণ। এটিও স্বাধীন ও উত্তম জীবিকা।

"১২। উদকবাদ্য—জলে কোন পাত্র রাখিয়া কিম্বা পাত্রে জল রাখিয়া নানা তালে বাদ্য করণ। ইহাতে লোকে চমৎকৃত ও আনন্দিত হইয়া অর্থ পুরস্কার করিয়া থাকে। এসকল আমোদের জীবিকা, সুতরাং ইহা ব্যাপক নহে। পাঠকগণ বোধ হয় জলতরঙ্গ নামক উদকবাদ্য অবগত আছেন।

"১৩। উদকঘাত—প্রাচীন পুস্তকে উদকঘাত শব্দের 'জলস্তম্ভ বিদ্যা' এইরূপ অর্থ দেখা যায়। মহাভারতে উল্লেখ আছে, দুর্য্যোধন জলস্তম্ভ বিদ্যা জানিতেন, তন্নিমিত্ত তিনি দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন উদকঘাত শব্দের অন্য কোন অর্থ আমরা জানি না। জলমগ্ন জাহাজের বস্তু উত্তোলনকারী ডুবুরিরাই এক্ষণে জলস্তম্ভ বিদ্যার অনুকরণ করিয়া থাকে মাত্র। প্রকৃত জলস্তম্ভ জানিলে বিপুল অর্থ উপার্জ্জনের সম্ভাবনা।

"১৪। চিত্রযোগ—অদ্ভুত কার্য্য প্রদর্শন করণ। ইহা এক প্রকার বাজী।

"১৫। মাল্যগ্রন্থনবিকল্প—নানা প্রকার মালা বা হার প্রস্তুত করা।

"১৬। শেখরাপীড়যোজনা—শিরোভূষণ অর্থাৎ টুপি পাগড়ী ও তাহার অলঙ্কার প্রস্তুত করণ।

"১৭। নেপথ্যযোগ—রঙ্গরচনা, অভিনেতা-দিগকে সাজান, তাহার উপকরণ প্রস্তুত করণ প্রভৃতি।

"১৮। কর্ণপত্রভঙ্গ—পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা মৃগমদ ও চন্দনাদির তিলকশ্রেণী ধারণ করিত, তাহাই কর্ণপত্রভঙ্গ নামে ব্যবহৃত হইত। যে নারী এই কার্য্যে কুশলা সেই নারীই পূর্ব্বে রাজমহিষীগণের নিকট সৈরিন্ধ্রী নামক দাসী পদ প্রাপ্ত হইতেন।

"১৯। গন্ধযুক্তি—নানাপ্রকার সুগন্ধ প্রস্তুত করণ। পারফিউম (perfume) এখন পূর্ব্বাপেক্ষা উপার্জ্জনের প্রশস্ত পথ।

"২০। ভূষণযুক্তি—অলঙ্কার নির্ম্মাণ ও তাহার গ্রন্থনাদি নির্ম্মাণ কার্য্যটি এক্ষণে শ্যাকরার হস্তে এবং গ্রন্থনকার্য্যটি পাটওয়ারদিগের হস্তে আছে।

"২১। ইন্দ্রজাল—ভোজবাজী। এটি অতি আশ্চর্য্য জীবিকা। ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীন।

"২২। কৌচুমারযোগ—নানা প্রকার লিপি-ক্রিয়াকে কৌচুমারযোগ বলে। ইতর ভাষায় যাহাকে জাল বলে, পূর্ব্বে তাহাই কৌচুমারযোগ শব্দে অভিহিত হইত। এটি বড় অসাধু জীবিকা। ইহাকে তস্কর-জীবিকা বলিলেও বলা যায়।

"২৩। হস্তলাঘব—অলক্ষ্যে অতি শীঘ্র হস্ত সঞ্চালন দ্বারা বস্তুর পরিবর্তন করা। ইহা এক চমৎকার বাজী। এখনও অনেক হস্তলাঘবপটু বাজীকর আছে।

"২৪। চিত্রভক্ষ্যক্রিয়া—আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করণ। ইহাতে বিলক্ষণ শিল্প সংযোগ ও অর্থাগম আছে। একজন কেরাণী অপেক্ষা একজন বাবুর্চ্চীর উপার্জ্জন অনেক অধিক। হালুইকারেরাও বড় অল্প উপার্জ্জন করে না।

"২৫। পানক-রসযোগ—মদ্য, নানাপ্রকার সরবৎ ও আচার মোরব্বা প্রভৃতি প্রস্তুত করণ। এটিও শিল্পঘটিত এবং আয়ের পথ।

"২৬। সূচী-বয়নকর্ম্ম—সূচীকার্য্য ও বস্ত্রবয়ন কার্য্য। ইহা একটি বিশেষ শিল্প। স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জ্জনের প্রশস্ত পথ। এক্ষণকার অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিই সূচীকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন বটে, কিন্তু কেহই বয়নকার্য্যে যাইতেছেন না। যাইবেন কি? যাইবার পথ বিদেশীয়দিগের দ্বারা অবরুদ্ধ।

বাদ্য।

লেখ্যচিত্র।

ইংরাজেরা বস্ত্রের কল প্রস্তুত করাতে তাঁতিরা নিরন্ন হইয়াছে। তথাপি চেষ্টা করা আবশ্যক।

"২৭। সূত্রক্রীড়া—সূত্রসংযোগে পুত্তলিকা পরিচালন (পুতুলের নাচ)। এটি অতি হীন ও সঙ্কীর্ণ জীবিকা।

"২৮। প্রহেলিকা—কবিতার গোপনীয় অর্থ পরিজ্ঞান। পূর্ব্বে ইহাতে লোকে চমৎকৃত হইয়া অর্থ পুরস্কার করিত। কিন্তু এখন ইহা কেহ শুনে না।

"২৯। প্রতিমালা—বস্তুর প্রতিরূপ প্রস্তুত করণ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ বিদ্যার একটি শাখা বাহির হইয়াছে, তাহার নাম 'ফটোগ্রাফী'।

"৩০। দুর্ব্বচনযোগ—যে সকল বাক্যের লিপির অর্থ সাধারণ লোকে বলিতে পারে না, তাহা বলা। এই বিদ্যাটি পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীগণের বিশেষ উপকারী।

"৩১। পুস্তকবাচন—অতি শীঘ্র বিলুপ্ত বর্ণ যোজনা করিয়া পুস্তক পড়া এবং নানা প্রকার অক্ষর পড়িতে পারা। এটিও পুরাতত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের সাহায্যকারী।

"৩২। নাটিকাখ্যায়িকাপ্রদর্শন—ইহা একপ্রকার যাত্রাওয়ালার কার্য্য কিম্বা নাটকাভিনয় দেখান।

"৩৩। কাব্যসমস্যাপূরণ—কাব্যের কিম্বা শ্লোকের একাংশ বলিলে তৎক্ষণাৎ তাহার অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া দেওয়া।

"৩৪। পট্টিকাবরাত্রাবাণবিকলপ—হস্তি, ঘোটক ও উষ্ট্র প্রভৃতির সাজ প্রস্তুত করণ এবং যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ।

"৩৫। তর্কুকর্ম্ম—ভ্রমি যন্ত্র ও তাহার সূক্ষ্ম লৌহ শলাকার নাম তর্কু। তদ্দ্বারা বহুবিধ স্থূল সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করণ।

"৩৬। তক্ষণক্রিয়া—কাষ্ঠের কার্য্য, ছুতার মিস্ত্রীই ইহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

"৩৭। বাস্তুবিদ্যা—গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য।

"৩৮। রূপ্যরত্নপরীক্ষা—সোণা রূপা ও হীরকাদি রত্নের পরীক্ষা। জহরীরাই ইহার উপকারিতা জানে।

"৩৯। ধাতুবাদ—সুবর্ণাদি ধাতুর সাঙ্কর্য্যপরিহার করণ ও তাহা প্রস্তুত করণ বিধি।

গন্ধযুক্তি।

"৪০। মণিরাগজ্ঞান—হীরক প্রভৃতি রত্নের বর্ণ পরীক্ষা ও নির্ম্মলকরণ প্রভৃতি জানা।

"৪১। আকরবিজ্ঞান—পরীক্ষার দ্বারা কোথায় কোন্ বস্তুর খনি আছে তাহা জানা।

"৪২। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ—বৃক্ষ লতা গুল্ম প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌গণের রোপণ, সংরক্ষণ, বৃদ্ধিকরণ ও চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞান।

"৪৩। মেষ-কুক্কুট-সাবকযুদ্ধবিধি—ম্যাড়ার লড়াই, কুক্কুটের লড়াই, বটেরের লড়াই প্রভৃতি এ সকল এখন নাই, কিন্তু মুসলমান বাদসাহদিগের সময়ে উক্ত শিল্পের দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন হইত।

"৪৪। শুক-সারিকালাপনা—পক্ষীদিগের বুলি শিখান। এ সকল জীবিকা এখন আর নাই।

"৪৫। উৎসাদন কর্ম্ম—কৌশলে শত্রুর বাস উচ্ছেদ করা।

"৪৬। কেশমার্জ্জন কৌশল—চুলের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার বিবিধ উপায়। পূর্ব্বে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এই কার্য্যের জন্য ভৃত্য নিযুক্ত করিতেন। এখনও বিদেশীয় পরামাণিকেরা একবার ক্ষৌর করিলে অন্যূন ১৲ টাকা লইয়া থাকেন।

"৪৭। অক্ষরমুষ্টিসংখ্যাকথন—সাঙ্কেতিক লিপি বিজ্ঞান।

"৪৮। ম্লেচ্ছতর্কবিকল্প—ম্লেচ্ছভাষা ও ম্লেচ্ছশাস্ত্র জানা। এখনও ইহার দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ আয়ের সম্ভাবনা আছে।

"৪৯। দেশভাষাবিজ্ঞান—ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা পরিজ্ঞাত থাকা।

"৫০। পুষ্পাশকটিকানিমিত্তজ্ঞান—পুষ্পাশকটিকা নামক বিদ্যার মূল উপকরণ জানা। পুষ্পশকটিকা বিদ্যা কি, তাহা আমরা জানি না।

"৫১। যন্ত্রমাতৃকা—অল্প আয়াসে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য বিবিধ যন্ত্র নির্ম্মাণ করা।

"৫২। ধারণমাতৃকা—পূজার নিমিত্ত, ধারণের নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত রেখাময় যন্ত্র রচনা করিতে জানা।

"৫৩। সম্পাদ্যকর্ম্ম—মণি মুক্তাদি রত্নের কৃত্রিম নির্ণয় করা এবং কৃত্রিম রত্ন প্রস্তুত করা।

"৫৪। মানসীকাব্যক্রিয়া—অন্যের মনের ভাব ছন্দের দ্বারা প্রকাশ করা, এরূপ কৌতুক আর নাই।

নৃত্য

"৫৫। কোষছন্দোবিজ্ঞান—শব্দশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া।

"৫৬। ক্রিয়াবিকল্প—একটি কার্য্য বহু উপায়ে নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা করা।

"৫৭। ছলিতকযোগ—পর প্রতারণার কৌশল। ইহাও একপ্রকার বাজী বিশেষ।

"৫৮। বস্ত্রগোপনক—এক বস্ত্র লইয়া অন্য প্রকার বস্ত্র দেখান। অর্থাৎ কার্পাস বস্ত্রকে রেশমী বস্ত্র করিয়া দেখান। এ শিল্পটির মর্ম্ম আমরা বুঝিতে অক্ষম।

"৫৯। দ্যূতপ্রভেদ—নানাপ্রকার জুয়াখেলা।

"৬০। আকর্ষণক্রীড়া—ইহাও একপ্রকার খেলা বটে, কিন্তু ইহা যে পূর্ব্বে কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

"৬১। বালক্রীড়নক—বালকদিগের জন্য নানাপ্রকার খেলনা প্রস্তুত করা, এই শিল্পটি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

"৬২। বৈয়াসকী বিদ্যা।
"৬৩। বৈজয়িকী বিদ্যা।
"৬৪। বৈণায়কী বিদ্যা।

এই তিনটি শিল্পের অর্থ আমরা জানি না। সুতরাং আংশিক ভাবও পাঠকগণকে বুঝাইতে পারিলাম না।"—বিজ্ঞানদর্পণ, ১২৮৯ কার্ত্তিক, পৌষ।

উল্লিখিত কয়েক ছত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে চতুঃষষ্টিকলার সকল এক্ষণে চলিত নাই, যাহা আছে তাহার কোনটি বা আংশিক প্রচলিত আছে, কালে তাহার আর প্রয়োজন হইবে না। কোন কোনটির বা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শাখা প্রশাখা হইয়াছে। কোন কোনটি বা এক্ষণে প্রচলিত না থাকিলেও পুনঃপ্রচলিত হওয়া উচিত।

লোকশিল্প প্রসঙ্গে

বিনয়েন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

সৌন্দর্যবোধ মানুষের আদিমবৃত্তি। তাই প্রাগৈতিহাসিক মানুষ আপন অন্তরের প্রেরণায় অপটু হাতেও শিলা-গাত্রে রেখে গেছে তার রসবোধের স্বাক্ষর। সেই অপরিণত সামান্য কয়েকটি রেখা ঐতিহাসিক সম্ভাবনায় আজ অসামান্য সম্পদ বলে পরিগণিত হচ্ছে।

তারপর হাজার হাজার বছর কেটে গেছে। ক্রমবিবর্তনে অগ্রগতির ধাক্কায় সেই অপরিণত রেখা ধারণ করেছে সাবলীল রূপ, সহজ ছন্দের গতি চকমকিয়ে উঠেছে রঙের বাহারে, সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্তির ঝিলিকে চাপা পড়েছে সরল প্রকাশভঙ্গিমা।

প্রত্যেক দেশেই এ ঘটনা ঘটেছে ব্যতিক্রমহীন-ভাবে, বিবর্তনের আইন অনুযায়ী। আমাদের দেশে ঘটেছে আরও ব্যপকরূপে। বিদেশী শাসকের কল্যাণে বিস্মৃতি ও বিভ্রম হয়েছে মারাত্মক।

বাংলার অতুলনীয় শিল্পকলার মৃত্যু হয়েছে পরিকল্পিত অভারতীয় কৃষ্টির নিষ্পেষণে। সম্মানহীন পরাধীন জাতির শিল্প কখনও দ্বিধাহীন সম্মান পায়নি। অসম্মানে ও অবহেলায় আবর্জনার ভেতর জীবন্মৃত হয়ে পড়েছিল লোকশিল্প। নেহাৎ কঠিন প্রাণ বলেই হয়তো মরেনি একেবারে। তবে কোনো কোনো শিল্পের দুর্বল জীবনীশক্তি হওয়ায় আঘাত সামলাতে না পেরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

আজ আমাদের শৃঙ্খল ঘুচেছে। নতুন করে নিজেদের জানছি, সত্যিকারের জানা। মিথ্যা শিক্ষার আবরণ সরিয়ে দিয়ে নিজস্ব ঐতিহ্যের স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করছি সব দিকেই, আর্টের ক্ষেত্রেও। কাজেই দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যমান গেছে বদ্‌লে। উপলব্ধি যতই গভীর হচ্ছে ততই অবাক হচ্ছি ভেবে, কি করে এতদিন অন্ধ হয়ে ছিলাম। বাংলার ব্রত আল্‌পনা আজ অপরূপ শুভ্রতা নিয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের সামনে। একান্ত সহজ রামায়ণগানের পটের ভেতর খুঁজে পাচ্ছি সরল অনায়াস প্রকাশের বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি। বাঙালীর সহজ জীবনযাত্রার নিত্যনৈমিত্তিক দ্রব্যের সরল অলঙ্কার আমাদের মুগ্ধ করছে এলিসের আশ্চর্য দেশে আসার মত। অনাড়ম্বর জীবনের প্রতিটি সামান্য দ্রব্যের ভেতর শিল্পীসুলভ রসজ্ঞানের নূতন পরিচয়ে আশ্চর্য হতে হয়।

বাংলাদেশের পর্তুগীজ আমলের রামায়ণ-পাটা।

বাংলার লোকশিল্পের একটা স্বাভাবিক আবেদন আছে যা সহজভাবে আকর্ষণ করে, স্পর্শ করে অন্তর। এতে গমক-গিট্‌কিরির প্রাবল্য নেই, আয়াসলব্ধ উপলব্ধির পীড়ন নেই, আছে বাউল গানের সরল অনবদ্য টান, যা বাঙালীর জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই অশিক্ষিত হাতে, স্তিমিত প্রদীপের আলোয় বোনা কাঁথার রূপাবলীর রচনা ও বর্ণসমন্বয় আমাদের অভিভূত করে শিল্পীর সহজাত মননশীলতায়। আধুনিক জ্যাকার্ড মেসিনে উৎপন্ন বস্ত্রে বর্ণের ও সামঞ্জস্যের উৎকর্ষে আমাদের চোখ তৃপ্ত হয়, কিন্তু অন্তর ভরে ওঠে না। কারণ এর সৃষ্টি মূলত ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে, সৃষ্টির উদ্দেশ্য সৃষ্টি নয়।

লোকশিল্পের এই সহজাত অনিবার্য আবেদন একে দিয়েছে সবল প্রাণশক্তি, যে কারণে এতদিন ধরে সমস্ত আঘাত ও কণ্ঠরোধ উপেক্ষা করেও বেঁচে আছে—হয়তো ভবিষ্যতেও বেঁচে থাকবে। প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠানের আঙ্গিক হিসেবেও এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা রয়েছে দৃঢ়। ভাবে প্রত্যেক বাঙালীর অন্তরে। প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক নিদর্শনরূপে এর প্রয়োজনীয়তা প্রায় অপরিহার্য। ইতিহাসের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সচারাচর যে সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ ঘটে তার স্বাক্ষর রেখে যায় লোকশিল্পের অঙ্গে, তাই একে দৃশ্য ইতিহাসবলা চলে।

লোকশিল্পের বিকাশের ধারা স্বতঃস্ফূর্ত, পার্বত্য স্রোতস্বতীর মত। প্রকাশের কুণ্ঠা নেই, আয়াসের কষ্ট নেই। আপন সহজতায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে আমাদের প্রতিদিনের নৈমিত্তিকের সঙ্গে। তাই খুঁজে দেখার তাগিদ দেয় নি।

পুঁথির মলাটে, লক্ষ্মীর সরাতে, পানের ডিবাতে, উপাধানে, প্রাঙ্গণে, দেয়ালগাত্রে, খেলার তাসে, সব দিক দিয়ে একান্ত স্বাভাবিক অস্তিত্বে আপনাকে ছড়িয়ে জড়িয়ে রেখেছিল আমাদের জীবনের সঙ্গে।

॥ ভাদ্র ও আশ্বিন

বাঁকুড়ার দশাবতারের মূর্তিসহ হাতে আঁকা
আর একটি গোল তাস।

বিনয়েন্দ্রনারায়ণের সংগ্রহ হইতে

আজ নতুন যুগে আমরা পুনরাবিষ্কার করছি এই স্বচ্ছন্দ সৌন্দর্যকে। ড্রয়িংরুম-এ স্থান পাচ্ছে চিত্রিত ঘট, মাটির পুতুল ও তার স্বগোত্রেরা।

কিন্তু এরও বিপদ আছে। কিউরিও-র সমাদর দিয়ে লোকশিল্পের রসশক্তির চুলচেরা বিচারে আপনার রসবোধের অস্তিত্ব স্বীকৃত হতে পারে কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পের বিকাশ ব্যাহত হয়। মুক্ত পাখিকে দামী খাঁচায় রেখে তার রঙের, গানের তারিফ করতে পারি কিন্তু স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ করি। পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচারে স্বচ্ছন্দ সরল প্রকাশভঙ্গির ওপর নানা ইজ্‌মের গুরুভার চাপিয়ে তাকে জটিল ও অসামান্য করে তোলা সম্ভব, কিন্তু তার সহজ সৌন্দর্যগতি অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়।

বর্তমান অবস্থায় মনে হয় সহজ ও ব্যাপক রসবোধ জাগরণের জন্য লোকশিল্পের এ ধরনের তারিফ কিছু প্রয়োজন, বিশেষ আজকালকার বিশেষত্বার যুগে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না এই রসবোধ ব্যাপক ও স্বাভাবিকভাবে আমাদের জীবনের অঙ্গাঙ্গিভূত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এর সম্পূর্ণ পুনরুত্থান সম্ভব নয়।

ও ভাই মোর ভাওয়ালিয়া রে—
চতুর্দিকে জ্বলে সুরজ বাতি
তোমার কেনে বল আঁধার রাতি হে,
হায় হায়, পরাণ বোঝা কতদিন বইবেন ভাই
ও ভাই মোর ভাওয়ালিয়া রে—
ওরে বালুতিতি পক্ষী কাঁদে হে
নিজের আহার খুঁজিবারে রে—
ওরে একবেলা তোমার অনু (অন্ন) জোটে হে
পিন্ধনো তোমার কাপড় কোঠে রে
হায় হায়, খালি পরিতেন লেংটি সব সার
ভাই মোর ভাওয়ালিয়া রে ॥

একটি ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীত

বাংলার নাট্যশালার দর্শক

অমল মিত্র

শ্যামবাজারের নবীন বসুর রঙ্গালয় সম্বন্ধে এর আগে কিছু বলেছি। শুধু যাত্রাভিনয়ে অভ্যস্ত এমন বহু বাঙালী দর্শকেরই নাট্যশালার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটেছিল এখানে। প্রভূত অর্থব্যয়ে শুধু সখ মেটাবার জন্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় তাও বলেছি। কিন্তু মাসের পর মাস লোকসান দিয়ে এ ধরনের এক নাট্যশালা বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। নবীনচন্দ্রের পক্ষেও তা সম্ভব হয়নি। একদিন এ রঙ্গালয় বন্ধ হল। তবে নানা দিক দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেল সে। প্রথম বাংলা নাটক সেখানে অভিনীত হল। রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীর আবির্ভাবও সেই প্রথম। সেদিনের সামাজিক পরিবেশে এ বড় কম কথা নয়। বিভিন্ন পত্রিকার পাতায় এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন হয়েছিল। আজ এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই ওঠে না, তাই সে আন্দোলন থাক।

এর পর বেশ কিছুদিন আর কোনো বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যায় না। তাই, কলকাতার বিদেশী রঙ্গালয়ে, চৌরঙ্গী থিয়েটারে নব্য বাঙালীরা যাতায়াত করত সেদিন। এদেশীয় পরিচালিত সংবাদপত্র তাদের উৎসাহ দিত। শুধু

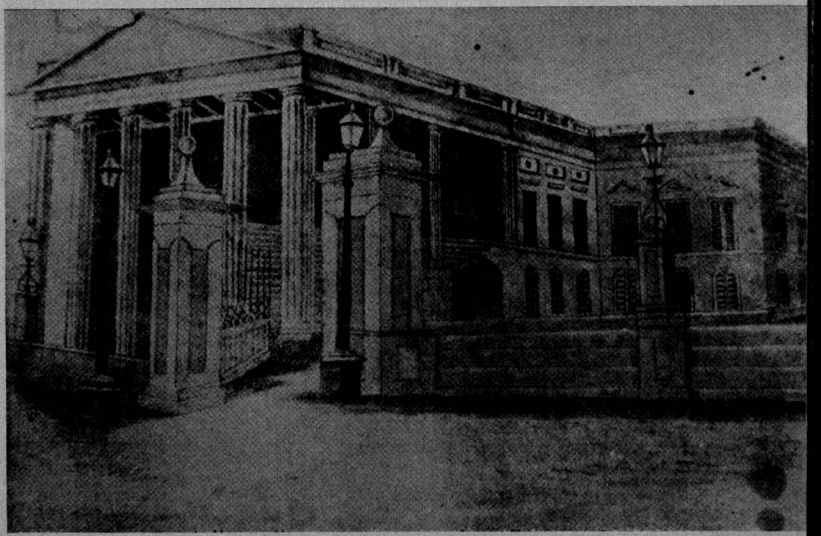

বিদেশী রঙ্গালয় 'সাঁ সুসি'। এখানে একদা বহু বাঙালী দর্শকের গতায়াত ছিল। এখন এখানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ।

তাই নয়, ওই ধরনের নাট্যশালা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গেও তারা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিদ্যা-সুন্দর অভিনয়ের বছর সুদূর ইতালী থেকে এক অপেরা দল কলকাতায় অভিনয় করতে এল। প্রসন্ন-কুমার ঠাকুরের 'ইণ্ডিয়ান রিফর্মার' পত্রিকা প্রশংসা করল তাদের অভিনয়ের। এদেশীয় দর্শকদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করল এর প্রতি। শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সকল দিক দিয়েই এই ধরনের নাটক অভিনয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করল। প্রসঙ্গত এও বলল, সৌন্দর্যবিহীন অমার্জিত প্রাচীন যাত্রা, কবি বা নাচ ত্যাগ করে, অন্তত শিক্ষিত বাঙালী চিত্ত-বিনোদনের জন্য যেন এদের অনুসরণ করে। সে-দিনের 'এশিয়াটিক জার্নাল'-এ এটি উদ্ধৃত হয়। 'রিফর্মার' বলে—

> This is not the first time that we have brought the claims of the Italian Company to the notice of our readers, particularly that of our countrymen, for whom these and all other theatrical exhibitions we consider as very improving. Their manner and carriage—even those of the educated portion,—yet require a good deal of polish, and we conceive they can nowhere learn them better than in places where they have the double advantage of instruction, from the representations on the stage, and from the manners of the Company that frequent those exhibitions. It is high time that our educated countrymen should substitute these refined amusements which afford entertainment for the senses, as well as the imagination, whilst they inform and instruct the mind, and improve taste, in the place of their ancient rude and gross 'Cobies' and 'Jattras' and 'Natches'. (Asiatic Journal, Sept. 1854.)

রিফর্মারের এই মন্তব্যে অথবা তখনকার ধনী বাঙালী গৃহে স্বল্পকালস্থায়ী দু-একটা নাট্যশালা গড়ে উঠেছিল বলেই প্রাচীন যাত্রার আয়ু ফুরিয়ে যায়নি। আভাবিক তা। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবেরও পূর্বে এর সৃষ্টি। সেদিনের যাত্রা ছিল দেবোৎসবেরই অঙ্গ। নামও ছিল ভিন্ন—নাটগীত। কবে কোন শুভ মুহূর্তে এর অভ্যুদয় ঘটে আজ আর তা জানা যায় না। অজানা অতীতে সে ইতিহাস হারিয়ে গেছে। এলেন শ্রীচৈতন্যদেব। বৈষ্ণবধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিস্তৃত হল। চৈতন্যপূর্ব যুগের শক্তিযাত্রার দিন ফুরাল। এল কৃষ্ণযাত্রা। রাধা-কৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গ নিয়ে নানা পালা রচিত হল। লিখলেন লোচনদাস, যদুনন্দন দাস, রূপ গোস্বামী, প্রেমদাস এবং আরো অনেকে। অধ্যাপক হোরেস হেম্যান উইলসন্ বলেন—

> The Yatra is generally the exhibition of some of the incidents in the youthful life of Krishna, maintained also in extempore dialogues, but interspersed with popular songs. (The Theatre of the Hindus, Vol. I.)

অধ্যাপক ম্যাক্‌ডনেল এই মতপোষণ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

> The Gitagobinda is concerned with Krishna, and the modern Jatras really represent scenes from the life of that deity.

বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ দেখি মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীরাধিকার ভূমিকায় যাত্রা করলেন এক সন্ধ্যায়। চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে। শুধু সঙ্গীত-বিদ্যা বা নৃত্যেই অপূর্ব পারদর্শিতা ছিল তা নয়, সুদক্ষ অভিনেতাও ছিলেন তিনি। মাঝরাত্রে রাধিকার বেশে অভিনয়ে যখন অবতীর্ণ হলেন, তরুন বেশভূষা, চলাফেরা দেখে কারো সাধ্যই ছিল না তাঁকে চিনতে পারে। ওই 'চৈতন্যভাগবতেই তা জানতে পারি। তাতে বলা হয়েছে—

> হেনই সময়ে সর্ব্ব প্রভু বিশ্বম্ভর।
> প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি বেশধর॥
> কেহ নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
> হেন অলক্ষিত বেশ অতি মনোহর॥

অন্যান্য ভূমিকায় শ্রীবাস, অদ্বৈতচার্য, নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীনিবাস প্রভৃতি মহাপ্রভুর স্নেহধন্য ভক্তেরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকেও মহাপ্রভুর স্বপার্ষদ যাত্রাভিনয় করার উল্লেখ দেখি। প্রসঙ্গত বলি, দর্শকমণ্ডলীর ভেতর মহিলারাও স্থান পেতেন। প্রথমোক্ত অভিনয়ে শচীমাতা নিজে উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া।

দান, মান, মাথুর, অক্রূর-সংবাদ, সুবল-সংবাদ

যে কোনো পালাই হোক, কৃষ্ণযাত্রা মাত্রেই কালীয়-দমন নামে পরিচিত ছিল একদিন। প্রায় চারশো বছরের ওপর পুরনো এই যাত্রাভিনয় সহজে বিলুপ্ত হবার নয়। শ্রীদাম, সুবল, পরমানন্দ দাস, গোবিন্দ অধিকারী, মদন অধিকারী গুভৃতি বহু শক্তিমান যাত্রাওয়ালার আবির্ভাব ঘটেছে এই বাংলাদেশে। রাতের পর রাত বহু বড় বড় আসর তারা মাতিয়ে গেছে। অগণিত রসিক শ্রোতা উপস্থিত থাকত সেই সব আসরে। চার পাঁচ ক্রোশ দূর থেকে পায়ে হেঁটে আসত অনেকেই। সার্থক হত তাদের পথশ্রম। যাত্রাশেষে আনন্দবিভোর হয়ে ঘরে ফিরত। নাটমন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ বা ওই ধরনের স্বল্পপরিসর স্থানে বৃহৎ দর্শকসমাগম সম্ভব নয় বলেই বারোয়ারীর সৃষ্টি হয়েছিল একদিন।

আঠারো এবং উনিশ শতকে এমনি বহু অবিস্মরণীয় যাত্রাওয়ালার দেখা পেয়েছিল কলকাতাবাসীরা। শোনা যায়, লোচন অধিকারীর অক্রূর-সংবাদ এবং নিমাই-সন্ন্যাসের আসরে কুমোরটুলির প্রখ্যাত ধনী বনমালী সরকার এবং শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ সংজ্ঞাশূন্য হন। মোটা টাকা বখশিস করেন অধিকারীটিকে। অবিশ্বাসের কারণ নেই, নজির আছে। যেমন, "করুণ রসে বিপ্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় কলিকাতার অন্য কোন ধনী ব্যক্তি ইঁহাকে গান গাইবার জন্য আহ্বান করিতে সাহসী হন নাই" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য —দীনেশচন্দ্র সেন)। আর এক অধিকারী, স্বরূপ দত্ত, দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রশংসায় ভরপুর হয়ে উঠলেন বিদ্যাসুন্দর পালা গেয়ে। সে যুগের মদন মাষ্টার, প্যারীমোহন, গোপাল উড়ে প্রভৃতির নামও স্মরণীয়। মহিলা-পরিচালিত যাত্রার দলও গড়ে উঠেছিল। যেমন, 'বউ-মাষ্টার,' আর 'বউ-কুণ্ডের' দল। সম্ভ্রান্ত ধনীরাও অনেকে যাত্রার দল করেছিলেন। তাঁরা, বীর নৃসিংহ মল্লিক, ছাতুবাবুর দেওয়ান রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়, টাকীর মুন্সী বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী, অমৃতবাজার পত্রিকার শিশির কুমার ঘোষ, রাজা রামমোহন রায়ের পরিবারের হরিমোহন রায় প্রভৃতি। অদ্ভুত খেয়ালী ছিলেন নাকি এই হরিমোহন! বহু আসরের

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

যাবতীয় খরচ অনেক সময় তিনিই বহন করতেন। কলকাতা থেকে হাতির পিঠে চড়ে দূর দূরান্তরে চলে যেতেন যাত্রাগান করতে। শুধু কলকাতা নয় তার আশ-পাশ এবং সুদূর পল্লী অঞ্চলেও যাত্রা ছড়িয়ে পড়েছিল। চুঁচড়া, চন্দননগর, নবদ্বীপ, বর্ধমান, বীরভূম এমন কি ঢাকায়ও বড় বড় যাত্রার আসরের সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে।

সকল কিছু সত্ত্বেও সেই উনবিংশ শতকেই ধীরে ধীরে যাত্রার দিন গেল। বিরুদ্ধ মনোভাবও দেখা দিল। বিশেষ করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই। কারণও যে ছিল না তা নয়। নাটকের বিষয়বস্তুর রূপান্তর ঘটেছিল। কৃষ্ণযাত্রা ছিল সকল বাঙালীরই মনের জিনিষ। চণ্ডীযাত্রা, রামযাত্রা প্রভৃতিও অনুষ্ঠিত হত। এ সবের জায়গায় এল বিদ্যাসুন্দর, নল-দময়ন্তী প্রভৃতি পালা। কালীয়দমনের দিন ফুরাল। "চৈতন্যদেবের পর ইহার জন্ম, রাজা রামমোহন রায়ের পর ইহার মৃত্যু" (বঙ্গদর্শন,

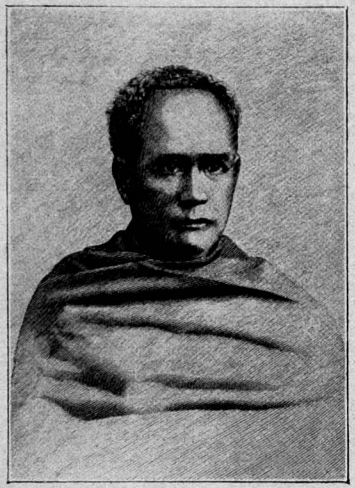

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ফাল্গুন, ১২৮৯)। শুধু তাই নয়, হাল্কা ধরনের নাচ, গানও যাত্রার আসরে ঢুকল। বাঈজীদের অনুকরণে খেমটা নাচের প্রবর্তন করল গোপাল উড়ের দলের কাশীনাথ। বিদ্যাসুন্দরে মালিনীর ভূমিকায় তার জোড়া পাওয়া যেত না। কেশেমালিনী নামে পরিচিতিও লাভ করেছিল সে। যাই হোক 'বঙ্গদর্শন' বলে—

> পূর্ব্বে বাঙ্গালায় খেমটা ছিল না। পূর্ব্ব পদ্ধতি অনুসারে অদ্যাপি যে সকল কালীয়-দমন যাত্রা আছে তাহাতে এই নৃত্য প্রচলিত নাই। কোন কোন দলে লোকরঞ্জন করিবার নিমিত্ত এই ঘৃণিত নৃত্য স্বতন্ত্র নর্ত্তক দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু মালিনী কি বিদ্যার ন্যায়, দূতী কি রাধিকা খেমটা নাচেন না।.....এই আধুনিক খেমটানাচ কোথা হইতে আসিল? (বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক, ১২৮০)

অথচ এই অসুন্দর ও দৃষ্টিকটু নাচ যাত্রাভিনয়ের একটা বিশেষ অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। স্থানে অস্থানে, কারণে অকারণে দেওয়া হত এই নাচ। পাত্র-পাত্রীরও বিচার ছিল বলে মনে হয় না। এমন দিনও এল যে, রাধা, কৃষ্ণ, সীতা সকলকেই নাচতে হল। যাত্রার অধঃপতিত এই দিনের বর্ণনা প্রসঙ্গে ওই 'বঙ্গদর্শন' বলে—

> যাত্রার প্রসঙ্গ হইলে অগ্রেই নৃত্যের কথা মনে পড়ে।.....এক্ষণকার যাত্রার নৃত্যই প্রবল, সকলেই নৃত্য করে। কৃষ্ণ নৃত্য করেন, রাধা নৃত্য করেন, রাবণ নৃত্য করেন, সীতা নৃত্য করেন, কৈকেয়ী নৃত্য করেন, বোধ হয় বৃদ্ধ রাজা দশরথও নৃত্য করিতেন, কিন্তু তিনি প্রায় সকল যাত্রার দলে 'বিহালা-ওয়ালা'। নৃত্য করিতে গেলে বিহালা বন্ধ হয়, নতুবা তাহার ত্রুটি ছিল না। (বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক, ১২৮০)

সঙ্গীত সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলতে পারে। গভীর ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতের পরিবর্তে নাচের সঙ্গে মিল রেখে হাল্কা টপ্পার প্রচলন হল। সঙ্গীত রচনার ভার পড়ল অনধিকারীর হাতে। "জেলে, মালা, কামার প্রভৃতি অশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে যে কেহ কথায় মিল করিতে পারিল সেই মনে করিল আমি গীত গাঁথিলাম যাত্রাকর তাহা গান করিয়া ভাবিলেন আমি গীত গাইলাম।" এর ওপর সঙের দৌরাত্ম্য ছিল। সকল শ্রেণীর দর্শকদের খুশী করার জন্যেই এই সঙের ব্যবস্থা। তাছাড়া, যাত্রা না জমলেই সঙের অবতারণা করা হত আসরে। অমনি অশিক্ষিত দর্শকদের মধ্যে সেই রুচিহীন হাবভাব এবং অসঙ্গত ও অমার্জিত উক্তিতে হাসির রোল পড়ে যেত। অনেক দুঃখেই মধুসূদনকে লিখতে হয়েছিল—

অলীক কুনাট্য রঙ্গে
মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে,
বিষবারি পান করে
তাহে হয় তনুমনঃ ক্ষয়।

মাঝে মাঝে মতি রায়, নীলকণ্ঠ প্রভৃতির মত এক আধজন এসেছে, এই সেদিনও। চেষ্টা করেছে

তারা যাত্রার পূর্বগৌরব উদ্ধার করতে। কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

এদিকে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ও তার বিস্তারে বাঙালীর রুচি পরিবর্তন ঘটল। বিশেষ করে শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের। ইংরেজী নাটক ও রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে এসেছিল তারা। এ ধরনের যাত্রা আর তাদের ভাল লাগার কথাও নয়। আকর্ষণের পরিবর্তে যাত্রার প্রতি একটা বিরূপতা এল মনে। অথচ নিজেদেরও কোন নাট্যশালা ছিল না। তবু যাত্রার আসরের প্রতি তাদের শিক্ষিত মন সাড়া দিল না। কলকাতার বিদেশী রঙ্গালয়ে তারা যাওয়া-আসা করত। 'সাঁ সুসি' মঞ্চে 'ম্যাকবেথ' দেখতে গিয়ে অনেকগুলি বাঙালী দর্শকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বড়লাট-ভগ্নী এমিলি ইডেন। স্বদেশে লেখা এক পত্রে সেকথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তিনি। তিন ভাগের এক ভাগ দর্শক নাকি সে রাত্রে এদেশীয় ছিল। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং সেখানকার শিক্ষাদীক্ষা এই রুচি পরিবর্তন এনেছে তাও তিনি বলে গেলেন। পত্রটির কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করি, হয়ত পাঠকদের ভাল লাগতে পারে। তিনি লেখেন—

> We went last night to see 'Macbeth'—a bold attempt, but we promised to go, and we were rather rewarded for the exertion, for it was remarkably well acted...... The house was over-full, and it must be a wonderful change to people who remember India ten years ago to see quantities of baboos, who could not get seats, standing on their benches reading their Shakespeares, and then looking off at the stage, and then applauding on the backs of their books. At least one third of the audience were natives, who were hardly admitted to the theatre when first we came, and certainly did not understand what they saw. The native generation who have been brought up at the Hindu College are perfectly mad about Shakespeare. (Letters from India, Vol. II, Hon'ble Emily Eden.)

কথিত আছে, ওই 'সাঁ সুসিতে'ই এক এদেশীয় শিল্পী অভিনয়ে অংশগ্রহণও করেছিলেন। অমর কবি সেক্সপিয়ারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক ওথেলোয় নামভূমিকায় তাঁর নাম ছিল বৈষ্ণবচরণ আঢ্য। অন্যান্য শিল্পীরা সকলেই ছিলেন বিদেশী। মাত্র দু'রাত্রি সে অভিনয় হয়। দ্বিতীয় রাত্রের অভিনয়ের বিজ্ঞাপনে দেখি এদেশীয় ছাত্রসম্প্রদায়ের বিশেষ অনুরোধেই সেটির ব্যবস্থা হয়েছিল। বিজ্ঞাপনে বলা হয়—

> ....Having received intimations from a number of influential persons as well as solicitations from a large body of Native students for a repeatation of the tragedy of Othello, Mr. Barry, ever anxious to acede to any wish that lies within his power or means to gratify or amuse a public who have ever evinced towards him the most friendly, kindly and liberal support, cheerfully complies with their request, and to enable his Juvenile Friends to fulfil their desire of support, Mr. Barry will, for this occasion, only, reduce the Prices....
> (Bengal Hurkaras, 12th Sept. 1848.)

ছাত্রসম্প্রদায়ের জন্য প্রবেশপত্রের মূল্যও হ্রাস করা হল।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ।

এমনি বহু অভিনয়েই বাঙালী দর্শকরা উপস্থিত থাকত। যাত্রার আসরে তখন ধীরে ধীরে ভাঙন ধরছে। নব্য শিক্ষিত, রুচিবাগীশ এই দর্শকদের ব্যবহারও ছিল মার্জিত। যাত্রার আসরে সে ধরনের শিষ্ট ব্যবহার সচরাচর পাওয়া যেত না। একবার কলকাতার এক ইংরেজী পত্রিকাও বিদেশী রঙ্গালয়ের বাঙালী দর্শকদের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। তারা বলে--

> A large sprinkling of natives attended and by their orderly conduct afforded a strong contrast to the proceedings of those whose birth, education and position in society ought alike to have taught them better. We must admit that in some things and some places young Bengal sets a good example to, and is an infinetely more unexceptionable neighbour than Young England.
>
> (The Calcutta Star, 19th Aug. 1848.)

এর পর বিদেশীর অনুকরণে নাটক অভিনয় বাঙালীর নাট্যশালা না থাকলেও কিছু কিছু চলতে লাগল। স্কুল কলেজের ছাত্রেরা আপন আপন বিদ্যালয়ে সে সব অভিনয় করত। অবশ্য ইংরেজী নাটকই মঞ্চস্থ করত তারা। যেমন, সেক্সপীয়ারের জুলিয়াস সীজার, মার্চেণ্ট অফ্ ভেনিস, ওথেলো ইত্যাদি। বহু বাঙালী দর্শক উপস্থিত থাকত। প্রসঙ্গত বলি প্রসন্নকুমারের 'হিন্দু থিয়েটার'-এ হিন্দু কলেজের বহু ছাত্র অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিল।

উনিশ শতকের শেষার্ধে নাট্যশালার দর্শকদের যেন বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা মিটতে চলল। চড়কডাঙার রামজয় বসাক, ছাতুবাবু, বেলগেছিয়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জোড়াসাঁকোর গণেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতি বহু ধনিগৃহে বিদেশীর অনুকরণে নাট্যশালা গড়ে নাটক অভিনয় হল। বেলগেছিয়ার নাট্যশালায় প্রথম কয়েক রাত্রি শুধু এদেশীয় দর্শকদের জন্যেই অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সেদিনের অভিনেতাদের মধ্যে যেমন কালীপ্রসন্ন সিংহ, জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়, তেমনি দর্শকদের মধ্যেও দেখি, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গৌরদাস বসাক প্রভৃতিরা উপস্থিত থাকতেন। সেদিনকার অভিনেতা এবং দর্শক দুয়েরই আকর্ষণ অনুভূতির বস্তু। একাধিক রঙ্গালয়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখা যেত। কলকাতার বাইরে চুঁচড়া প্রভৃতি অঞ্চলেও নাট্যশালা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল সেদিন। পূর্বোক্ত কোন অভিনয় দেখতেই প্রবেশমূল্য লাগত না। পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়িতে আবার 'ফ্রি টিকিট' দেওয়া হত। প্রবেশপথে তা দেখাতে না পারলে দ্বারবানের হাতে লাঞ্ছিতও হতে হয়েছে অনেক ভদ্র দর্শককে। এমনকি শোনা যায়, যুবক গিরিশচন্দ্র ঘোষকেও একদিন এই ধরনের বিড়ম্বনা ভুগতে হয়েছিল। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টার মূলেও নাকি এটি একটি অন্যতম কারণ ছিল। ধনিগৃহের নাটকাভিনয়ে পয়সা না লাগলেও সাধারণ দর্শকদের পক্ষে অনেক

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ।

সময়েই প্রবেশাধিকার পাওয়া কঠিন ছিল। অথচ যাত্রার আয়ু সেদিন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। তার অতীতের বিরাট আসর পাতলা হয়ে এসেছে। নাট্যশালার দর্শকসংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছিল। ১৮৭২ সালে তাই সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হল। বাংলার দর্শকসমাজ বিদেশী ধরনের নাট্যাভিনয় সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করল। প্রবর্তন হল নতুন নাট্যযুগের। সমাগম ঘটল সার্থক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর। জনপ্রিয়তার সঙ্গে সুরুচিসম্পন্ন মন এসে হাত মেলালো। সেই সঙ্গে চোখ বদলাল, দৃষ্টি বদলাল যাত্রার দর্শকদেরও। অভিজাত এবং আভিজাত্যের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে উন্মুক্ত হল রঙ্গালয়ের সার্বজনীন দর্শকদ্বার। বাংলাদেশের রঙ্গালয় ও নাট্যশালার দর্শকদের ইতিহাসে সেটা এক নতুন অধ্যায়।

কথাকলি ও গোপীনাথ সম্প্রদায়

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতীয় নৃত্যের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কথাকলির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। দক্ষিণ-ভারতের ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যে কথাকলি নৃত্যের জন্ম। কিন্তু ভারতীয় নৃত্য বিষয়ে গবেষকগণ কথাকলি নৃত্যের জন্মসময় নির্ধারণে একমত নন। কথিত আছে যে দক্ষিণ-ভারতের কোজিকোড নামক স্থানের কাছাকাছি এক জায়গায় জনৈক রাজা 'কৃষ্ণনাট্যম্' নামে এক ধরনের ধর্মীয় নাটক অভিনয়ের আয়োজন করেন। এই অভিনয় বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং এ খবর শুনে ত্রিবাঙ্কুরের কোট্টারাক্কারার রাজা পূর্বোক্ত রাজার কাছে তাঁর রাজসভায় কৃষ্ণনাট্যম্-এর দলটিকে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করে পাঠান। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে বা ঈর্ষাপ্রসূত কোন মনোভাবের জন্যই হোক, উক্ত রাজা সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তখন কোট্টারাক্কারার রাজা 'রামনাট্যম্' নামে অন্য ধরনের একটি জনপ্রিয় নাটক অভিনয়ের আয়োজন করান। কেরালার উত্তরাংশে প্রচলিত ধারণা এই যে এই রামনাট্যম্ই পরে কথাকলি নামে অভিহিত হয়েছে। কিন্তু কেরালার দক্ষিণাংশে কোট্টারাক্কারার আশেপাশে

নৃত্যরত জনৈক শিল্পী।

প্রচলিত ধারণা এই যে রামনাট্যম্ বা কথাকলির উৎপত্তির পরে কৃষ্ণনাট্যমের উৎপত্তি হয়। কিন্তু কৃষ্ণনাট্যমের রচয়িতা নাটকের শেষাংশে ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে নাটকটির রচনাকাল বলে উল্লেখ করেছেন। বিশিষ্ট গবেষকদের মতে রামনাট্যম্-এর রচয়িতা পঞ্চদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন এবং তাঁদের মতে রামনাট্যম্-এর রচনাকাল ১৪৮৩ থেকে ১৪৯১ সালের মধ্যে। এই তথ্যে রামনাট্যম্ রচনাকালের হদিস পাওয়া গেলেও কথাকলি নাচের উৎপত্তির সঠিক সাল পাওয়া যায় না। তবে এ কথা অনুমান করা যেতে পারে যে কথাকলি নৃত্যের উৎপত্তি পঞ্চদশ শতাব্দীতে।

কথাকলি নৃত্যের একটি অভিনয়দৃশ্য।

সেই সময় বেশ কিছুদিন অভিজাত ধনী পরিবারে কথাকলি নাচের বেশ আদর ছিল। তারপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে মাঝে কিছুদিন অন্যান্য নাচের মত কথাকলিরও আদর কিছু কমেছিল। কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে অধুনা আবার আমরা আমাদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছি এবং পুরোনো জিনিষের আদর করতে শিখছি।

কথাকলি নাচ হল অভিনয়-প্রধান। কোট্টারাক্কারার রাজার রামায়ণের গল্প অবলম্বনে লিখিত রচনাই কথাকলির সর্বপ্রাচীন রচনা বলে জানা যায়। এই নৃত্যাভিনয় সম্পূর্ণ করতে হলে আট রাত্রি পরপর অনুষ্ঠান করতে হত। তারপর অনেক ক্ষমতাশালী কবি কথাকলি নাচের জন্য বিষয়বস্তু রচনা করেছেন। প্রায়

নারী ও পুরুষ চরিত্রের সম্মিলনে কথাকলির একটি নৃত্যদৃশ্য।

দুশোর মত রচনা পাওয়া যায়; তার মধ্যে চব্বিশ পঁচিশটি বেশ জনপ্রিয়। কথাকলির বিষয়বস্তু হল রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণ অবলম্বন করে এবং এর চরিত্রগুলিও তাই সত্ত্ব, রজঃ ও তম ভাবে প্রভাবিত পৌরাণিক চরিত্র। এদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জা প্রসাধনাদিও তদনুরূপ। কথাকলির চরিত্রগুলি পৌরাণিক মহাকাব্যগুলি থেকে নেওয়া বলে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কল্পনাকেই প্রাধান্য দেওয়া

হয়। শিল্পের উৎকর্ষ ও প্রয়োজনীয়তাও অবশ্য এ বিষয়ে বিচার করা হয়। অনেক সমালোচকই কথাকলির সাজপোষাকের ও অঙ্গসজ্জার অতিপ্রাধান্যকে অবাস্তব বলে থাকেন; কিন্তু কথাকলির নাচের যে ঐগুলি একটি বিশেষত্ব একথা স্বীকার করতেই হয়।

কথাকলি নাচে পারদর্শিতা অর্জন করা ও প্রকাশ করা সহজসাধ্য কাজ নয়; কারণ, এতে অভিনয়কলা এবং নৃত্যকলা এই দুই বিষয়েই সমান অধিকার থাকা দরকার। অভিনয়ের ক্ষমতাও সাধারণ নাটকের অভিনেতাদের চেয়ে বেশি দরকার। এতে কথোপকথনের সঙ্গে ভাব প্রকাশ করার সুযোগ নেই। অভিনয় নির্বাক হবে, অথচ সমস্ত ভাবটি দর্শকচিত্তে সঞ্চারিত করতে হবে। একাজ যে খুব সহজ নয়, তা সকলেই উপলব্ধি করবেন। নাচের সঙ্গে সঙ্গে কেবল মুখভঙ্গি ও মুদ্রার সাহায্যে বক্তব্য বিষয়টি বা বিশেষ ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে হয়। সেই ভাবপ্রকাশের সময় শিল্পীকে সচেতন থাকতে হয় যাতে নাচের ভঙ্গিমার এবং আবহ-সঙ্গীতের সঙ্গে ভাবপ্রকাশের সামঞ্জস্য থাকে। এইগুলি যে শিল্পী পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করতে পারেন, তিনিই সার্থকতা লাভ করেন এবং তাঁর নাচ সকলকে মুগ্ধ করে। মুখে ভাবপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হস্তভঙ্গিমা বা মুদ্রাও একটি বিশেষ ভাব ব্যক্ত করতে বিশেষ সাহায্য করে। যে বর্ণনা নেপথ্যে দেওয়া হয় বা যে গান গাওয়া হয়, তার ভাবগুলি শিল্পীকে নৃত্য ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হয়। নৃত্য ও অভিনয়ের মধ্যে মুদ্রাগুলি ছন্দসুষম সেতুর কাজ করে। ২৪টি মূল মুদ্রা ভেঙ্গে প্রায় ৭০০ বিভিন্ন মুদ্রা সৃষ্টি করা হয়েছে। কথাকলি নাচে সঙ্গীতাংশও বিশেষ প্রয়োজনীয়। কণ্ঠ-সঙ্গীতে দু-জন এবং যন্ত্রসঙ্গীতে তিন-চারজন সুদক্ষ শিল্পী সাধারণত সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন। কথাকলিতে সঙ্গীতাংশের বিশেষ প্রাধান্যের কারণ এই যে এর গল্পাংশের কথোপকথনগুলি গানের সুরে গীত হয়। কথাকলির নৃত্যের সঙ্গে যে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়, তা কর্ণাটিক সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শ্রেণীতে পড়ে। কথাকলি নাচের একটি বিশেষত্ব এই যে এর নৃত্যছন্দ, অঙ্গভঙ্গি, মুখে ভাবপ্রকাশ, কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত, সাজপোষাক, প্রসাধনের ঘটা সব কিছু মিলিয়ে একটি যুক্ত আবেদন সৃষ্টি হয়। তাই কোন

বিশেষ সজ্জায় জনৈক কথাকলি নর্তক।

কথাকলি নাচের অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হতে হলে, তাতে এর বিভিন্ন অংশগুলিকে সমান সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত করতে হবে।

দক্ষিণ-ভারতের কেরালা অঞ্চলের এই কথাকলি ভারতীয় নৃত্যের অন্যতম প্রধান ধারা। আর বর্তমানে নাটকলানিধি গোপীনাথ এই প্রাচীন নৃত্যধারার অন্যতম প্রতিভাশালী ধারক। কিছুদিন আগে মাদ্রাজে এবং

বিশেষ ভঙ্গীতে জনৈক শিল্পী।

তারপর কলকাতায় গোপীনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়ের শিল্পীদের পরিবেশিত কথাকলি নাচের অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে এঁদের কথাকলি নাচের অনুষ্ঠান দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। গোপীনাথ নিজে একজন প্রতিভাধর শিল্পী এবং নৃত্যকলালক্ষ্মীর একজন আন্তরিক ও একনিষ্ঠ সেবক। সেবার এই আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার জন্যই তিনি আজ এত সাফল্য লাভ করতে পেরেছেন। তাঁর নৃত্যানুষ্ঠান তাই দর্শকদের ক্লাসিক্যাল নৃত্যের রসলোকে উত্তীর্ণ করতে পারে। তিনি যে শুধু নৃত্যছন্দ এবং

বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নৃত্যরত গোপীনাথ।

বিভিন্ন মুদ্রাবিদ্যাতেই পারদর্শী তা নয়; তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে মানুষের ও জীবজন্তুর আনন্দ, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা প্রভৃতি ভাবপ্রকাশেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বল্লেও চলে। 'অঞ্জলীয়চূড়ামণি' নৃত্যনাট্যে হনুমানের ভূমিকায় যাঁরা তাঁর নৃত্যাভিনয় দেখেছেন, আশা করি তাঁরা সকলেই একমত হবেন যে—তা গোপীনাথের একটি অপূর্ব ক্ষমতার পরিচায়ক। তাঁর চলাফেরা, সবিনয়ে দাঁড়ান এবং কেবলমাত্র মুদ্রা ও মুখভঙ্গির সাহায্যে সীতাকে তাঁর বক্তব্য বিষয় বুঝিয়ে বলা এগুলি প্রত্যেক দর্শকচিত্তেই সাড়া জাগায়। গোপীনাথ দশ বছর আগে কলকাতায় একবার তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে নৃত্যানুষ্ঠান করে গেছেন। তখন কিন্তু তিনি এবারের মত দর্শকচিত্ত জয় করতে পারেননি। তার কারণ বোধ হয় এই যে সে সময় তিনি কেবল ব্যাকরণসম্মত কথাকলিকে অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি দেখা গেল যে তাঁর নৃত্যানুষ্ঠানে তিনি ব্যাকরণকে মেনেও নতুন রসসৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তার ফলে একদিকে তাঁর নাচে প্রাচীন নৃত্যধারার ঐতিহ্য বজায় আছে, আর একদিকে তাঁর প্রতিভাসিক্ত রসসংযোজনায় তা আজকের দিনের আলোকপ্রাপ্ত দর্শকমণ্ডলীর চিত্তে রসের আবেদন জাগাতে সক্ষম। এইখানেই তাঁর সাফল্য। ব্যক্তিগতভাবে নর্তক হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর বাহুসঞ্চালনের ছন্দ, চোখের বিভিন্ন প্রকার গতি ও ভুরুর ঢেউ, মুহূর্তে মুহূর্তে মুখের ভাব-পরিবর্তনের অদ্ভুত ক্ষমতা—হাস্য, বীর, করুণ, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত প্রভৃতি বিভিন্ন রসের অভিব্যক্তি সমান স্বাচ্ছন্দ্যে ফুটিয়ে তোলা, আর আশ্চর্য সামঞ্জস্যময় নৃত্যাভিনয়,—সব মিলিয়ে নর্তক হিসাবে তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

গোপীনাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে, তাঁর পরেই উল্লেখ-

যোগ্য হলেন তঙ্কমণি। তিনিও কথাকলি নৃত্যে বিশেষ পারদর্শিনী। সম্প্রদায়ের অন্যান্য নৃত্যশিল্পী এবং সঙ্গীতশিল্পীরা প্রত্যেকেই দক্ষ এবং ক্ষমতার অধিকারী।

বেশ প্রাচীন হলেও কথাকলি নাচের গৌরব আজও ম্লান হয়নি। শিল্পী পরম্পরায় এই নৃত্য-ধারার ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছেন। সত্যিকারের শিল্পের আবেদন শাশ্বত, তাই আশা করা যেতে পারে, শুধু আশা নয় বিশ্বাস, ভরতনাট্যম, কথক ও মণিপুরীর সঙ্গে কথাকলি নাচের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যও ভারতবর্ষে বজায় থাকবে। আর শুধু বজায় থাকবেই বা কেন, শিল্পীরা যদি একাগ্র ও একনিষ্ঠ শিল্প-সাধক হন, তাহলে সে ঐতিহ্য অধিকতর গৌরবোজ্জ্বল হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অনুপস্থিত।

।। অঙ্গসজ্জারত নৃত্যশিল্পী গোপীনাথ ।।

অবনীন্দ্র জন্মদিনে

দেবনাথ মুখোপাধ্যায়

দিনটি জন্মাষ্টমীর দিন। বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরের সঙ্গে বর্ষার মেঘের চলেছে অপূর্ব লুকোচুরি। আকাশে মেঘের ঘনঘটা আলোর আবদারকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে আসছে। আমরা তখন বি. টি. রোডে, অর্থাৎ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে। বাসের বুকের মধ্যে ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলেছি এগিয়ে। এই শুভ জন্মাষ্টমীতেই শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিন। ভারতের শিল্পের জন্য যিনি জীবনপাত করেছেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই যিনি রূপলোকের স্বাধীনতার বরমাল্য দেশমাতৃকার কণ্ঠে দুলিয়েছেন, সেই শিল্পগুরু সর্বযুগের শ্রষ্টা অবনীন্দ্রনাথের চরণে প্রণাম জানাবার উদ্দেশ্যে চলেছিলাম আমরা তিনটিতে—আমি ও আমার দুজন শিল্পী-বন্ধু।

শিল্পী দেবনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদীপের আলোয় আঁকা অবনীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি।

বাসের ঝাঁকুনি, কন্ডাক্টরের চেঁচামেচি আরোহী-দের ঠেলাঠেলির কিছুই খেয়াল ছিল না। সব কিছু ছাপিয়ে মনের মধ্যে তখন তোলপাড় করছিল ওকা-কুরার কথা ''এমন এক প্রতিভা পাঁচশ বছরে আসে একবার''। মনে পড়ল দেশবাসীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের পুচ্ছন্ন আবেদন, ''আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্র-নাথের নাম।''

একটা আশ্চর্য অনুভূতি তখন প্রাণের প্রাকারে আছড়ে আছড়ে পড়ছিল তরঙ্গভঙ্গের মত। দিবা অবসানের ম্লান দৃষ্টি-ভেজা আলোর সঙ্গে মিলেছে তখন মেঘের গুরুগুরু ধ্বনি। বিকেল গড়িয়ে তখন গোধূলির গায়ে ঢলে পড়েছে। বাস ততক্ষণে ডানলপ ব্রিজের তলায়। আর একটু এগিয়ে এসে আমরা বাস থেকে নেমে পড়লাম। তিনজনের কারুর মুখে তখন কথাটি নেই। ব্রিজ পেরিয়েই বাঁদিকে 'গুপ্ত নিবাসের' ফটক। শিল্পগুরুর বাসস্থান। মনুমঞ্জরীর মৃদু গন্ধের মূর্চ্ছনা ঘ্রাণলোকে জাগিয়েছে যেন বিলম্বিত তিলক কামোদের আলাপ। সেই আগত সন্ধ্যার আবছা আলোয় রূপকথার রাজত্বের দেখা-না-দেখায় মেশা বাগানের পথটি বর্ণনাতীত। কিন্তু অগো-ছালো গাছের অপর্যাপ্ততার মধ্যে সাগ্রির মত চুপ করে

দাঁড়িয়ে থাকা ঐ সারিবন্দী সুপুরি গাছের মত ওগুলো কি গাছ? যে গাছই হোক না কেন বর্ষণোন্মুখ বাতাসে পাখার মত পত্র বিস্তার করে সেদিন ওরা মর্মরধ্বনিতে স্বাগতম জানাচ্ছিল যেন আমাদের। এতক্ষণে অনুভব করলাম কলকাতা ছেড়ে কেন শিল্পগুরু এখানে এসে তাঁর আবাস রচনা করেছেন।

মনে আছে, শিল্পীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অলকেন্দ্রনাথই প্রথম নেমে এলেন নীচে। যথেষ্ট সঙ্কোচ ছিল আমাদের। বিনা খবরে আসা হয়েছিল কি না! হয়তো বা এটা অসময়ও হতে পারে। আশঙ্কা ছিল—যদি দেখা না হয়।

এবার অলকেন্দ্রনাথ তাঁর পুত্রের হাতে সমর্পণ করলেন আমাদের। তাঁর পুত্র যার ডাকনাম বাদ্‌শা—আমাদের সমবয়সী এবং বন্ধুজনও বটে।

বাদ্‌শা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। সিঁড়ি দিয়ে বাদ্‌শার পিছনে পিছনে উঠছি আমরা। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে নজরে পড়লো অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত কতকগুলি সুবিখ্যাত ছবি। আশে-পাশে ছোট ছোট মাটির টবে কত না ক্ষুদে ক্যাক্‌টাস সারি-বন্দী সাজানো। এর পরই দালানে এলাম—আর এক দক্ষিণের দালান। যেখানে আরাম কেদারায় অর্ধ-এলায়িত শিল্পগুরু। আমরা সবাই তখন প্রণাম করেছি। জিজ্ঞাসা করলেন—"এই বাদলায় আসতে খুব কষ্ট হলো তো?"

বাদ্‌শার সঙ্গে এবার এলাম ছবির ঘরে। লম্বা ঘর—চার দেয়ালে যেন ছবির চাঁদোয়া ঝোলানো। শিল্পীদের তীর্থই বটে। মনে হচ্ছিল এই ঘরের ধুলোয় ধুলোট করতে পারলে ধন্য হতো জীবন। সুযোগ থাকলে বরাতের বিগ্রহের নিকট আজীবন বন্দীত্ব প্রার্থনা করতাম এই ঘরে থাকার জন্যে। সেই চার দেয়ালের সীমানা টানা ঘরটার অসীম রূপলোক সেদিন প্রাণভরে উপভোগ করেছি। অনুভব করেছি অন্তর দিয়ে।

বাড়ি ফিরে এসেছি তখন। অর্থাৎ গুরুদর্শনান্তে ফিরে এসেছি বরানগর থেকে কলকাতায়। বাইরে তখনও চলেছে বর্ষার হাওয়ার সেই একই রকম মাতা-মাতি, গুরুগুরু মেঘের ডম্বরু ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনিত হচ্ছে। মন তখন কিন্তু স্থির আর ভরপুর। অজন্তার সেই বুদ্ধের রেখাচিত্র আর শিল্পগুরুর আজকের চেহারা আশ্চর্য একাকার হয়ে গেছে মনের মধ্যে। মনে হলো অজন্তা যেন শিল্পগুরুর চেহারায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে আর অজন্তার মধ্যেই যেন রূপ পরিগ্রহ করেছেন শিল্পগুরু।

রাত তখন গভীর। মানসলোকে অবনীন্দ্রনাথের যে ছবি বারম্বার অনুভব করলাম তাকে কাগজের মধ্যে ধরে রাখার দুর্বার বাসনায় তখন ব্যাকুল। বাতি জ্বাললুম। দুর্যোধ্য খেয়াল। চোখ-ধাঁধানো বিজলির তীক্ষ্ণ বাতি নয়—মাটির প্রদীপ। তেলের আলোর ম্লান স্নিগ্ধতায় আঁকলাম শিল্পগুরুর প্রতিকৃতি, যেমন মনে এসেছিল ঠিক তেমনিটি করে। তখনো চেয়ে ছিলাম শেষ-হয়ে-যাওয়া ছবিটির দিকে। রাত্রিও তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মনে হলো—শিল্পী হিসাবে পুরানো সংস্কারকে অবনীন্দ্রনাথ সব সময় চির নূতনত্বের অর্থাৎ মডার্নিজমের আঘাতে নাড়িয়ে গেছেন—এমন কি মৃত্যুর পরেও তিনি কালের যাত্রায় পিছিয়ে যেতে নারাজ, আর তাই ত ওকাকুরা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সেই কথাই জানিয়ে বলেছেন, ওকাকুরা নন্দলালদের বলেছিলেন—"দশ বছর আগে আমি যখন এসেছিলাম তখন তোমাদের আজ-কালকার আর্ট বলে কিছুই দেখিনি। এবারে দেখছি তোমাদের আর্ট 'হবার' দিকে যাচ্ছে। আবার যদি

দশ বছর বাদে আসি তখন হয়তো দেখবো 'হয়েছে' কিছু।'—তিনিও আর এলেন না, আমিও বসে আছি দেখার জন্য.....হয়তো আবার আমাকে আসতে হবে, পথ আছে কি?"

এর পর কতবার গেছি এসেছি—এই সেদিনো তো গেছিলাম 'গুপ্তনিবাসে', যেস্থান ভারতের কালজয়ী শিল্পগুরুর শেষ নিঃশ্বাসে পবিত্র। ভারতের প্রত্যেক শিল্পীর কাছে এই স্থান একটি মহান পুণ্য তীর্থ যে। এই তো সেদিনও সেই দক্ষিণের দালানটিতে উঁকি মেরে দেখলাম শূন্য আরামকেদারাটি খালি পড়ে রয়েছে। পাশের দেয়ালের ঘড়ি থেকে এক টুকরো সুতো দিয়ে বাড়ির কোনো ছোট ছেলে ঝুলিয়ে দিয়েছে ছোট একটি ডানা-মেলা হাঁস, হাওয়ায় সেটা দুলছে। আর তারই ঠিক উপরে তালে তালে দুলছে ঘড়ির পেণ্ডুলামটাও।

সময় চলেছে ঠিক.....টিক্ টিক্ টিক্।

শিল্পী চলে গেছেন ঠিকই—কিন্তু তাঁর সৃষ্টি রয়ে গেছে, যা সময়ের সমুদ্র ভেঙে মাথা উঁচু করে আজও দাঁড়িয়ে আছে স্থির পর্বতের মত।

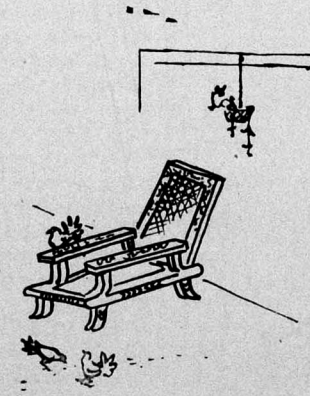

কোলা ব্যাঙের ডাক—
কেয়া ফুলের গন্ধ!

রং-এর দরকার আছে কি কিছু?

ঝিম্ ঝিম্
রিম্ ঝিম্

সন্দেহ জাগে
ওটা কেয়ার গন্ধ, না তোমার কেশের?

একটি জাপানী কবিতার অনুসরণে

প্রচারশিল্পী ও, সি

রঘুনাথ গোস্বামী

ভারতীয় বিজ্ঞাপনশিল্পে ও, সি, গাঙ্গুলী একজন দিকপাল। ভবিষ্যত ভারতীয় বিজ্ঞাপনশিল্পের যদি ইতিহাস লেখা হয় তবে যে স্বল্পকয়জন শিল্পীর নাম তালিকার প্রথম সারিতে থাকবে ও, সি, গাঙ্গুলী তাদের মধ্যে একজন।

ও, সি, গাঙ্গুলীর সংসার-আশ্রমের নাম হল অরুণ কুমার গাঙ্গুলী, কিন্তু বিজ্ঞাপনের জগতে তিনি ও, সি, নামেই প্রসিদ্ধ। বর্তমান প্রবন্ধে আমরাও তাঁকে ও, সি, নামেই অভিহিত করব। আর একটা কথা এই সঙ্গে বলে নেওয়া দরকার। শিল্প সমালোচক ও, সি, গাঙ্গুলী এবং আমাদের আলোচ্য শিল্পী পৃথক ব্যক্তি। প্রথমোক্ত ব্যক্তি গুম্ফসমন্বিত শেষোক্ত ব্যক্তি মুণ্ডিতগুম্ফ।

ছেলেবেলাটা কেটেছে আর পাঁচটা অতি সাধারণ ছেলের মতই সারাদিন ধরে টৈ টৈ করে ঘুরে বেড়িয়ে আর ফুটবল খেলে। ছোটবেলায় যে সময়টা ছবি আঁকার করণ-কৌশল শিখলেই হয়ত তাঁকে বেশি মানাত সেই সময়টা তিনি ট্রামের চাকার তলায় ভাঙ্গা শিশি বোতলের কাঁচ গুঁড়িয়ে তাই দিয়ে ঘুড়ির মাঞ্জা তৈরী করার নানা মোক্ষম মোক্ষম পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করে আর প্রাণপণে ফুটবল খেলে কাটিয়েছেন। আর্টিষ্ট হিসাবে পরিচিত হবার পরও তিনি মণীন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ড ফাইনালে খেলেছেন।

বড় ভাই ভগবান গাঙ্গুলী ছবি আঁকতেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু যখন সন্ন্যাসী গগেন মহারাজের বাড়িতে থাকতেন সেই সময় বড় ভাই ভগবান গাঙ্গুলী নন্দলালের কাছে ছবি আঁকার তালিম নিতে যেতেন। সেই সূত্রে ও, সি,-ও যাতায়াত করতেন ভাই-এর সঙ্গে ফাউ হিসাবে। কিন্তু ছবি আঁকার ব্যাপারে তিনি খুব একটা কিছু বাহাদুরী দেখাতে পারতেন না। নন্দলালের মত একজন মহাশিল্পীর সংস্পর্শ উত্তর জীবনে তাঁর শিল্পবোধ জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। এ ছাড়া তিনি অবনীন্দ্রনাথের সংস্পর্শেও এসেছিলেন এবং স্বল্প কয়দিন ছবিও এঁকেছিলেন তাঁর কাছে।

আর্টস্কুলে তাঁর জায়গা হয়নি। বড় ভাই ভগবান গাঙ্গুলী ও তিনি আর্টস্কুলে ভর্তি হতে যান এবং ভগবান গাঙ্গুলী প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করে আর্ট স্কুলে ভর্তি হন এবং ও, সি ফেল করে চলে আসেন। ফলে

ও, সি, অঙ্কিত কে, এল, এম-এর বিজ্ঞাপন চিত্র।

ভাল করে ছবি আঁকা শেখার সুযোগ তাঁর প্রথম জীবনে ঘটে ওঠেনি।

ও, সি,-র প্রথম চাকরীজীবন শুরু হয় ১৯৩৭ সালে। কলকাতার ষ্ট্রোনাক এ্যাডভারটাইজিং-এ তিনি প্রথম চাকরী পান। কাজ হল ফরমায়েশমত কাগজ কাটা এবং মক্কেলদের কাছে ডিজাইন পাঠানোর জন্য পোর্ট-ফোলিও তৈরী করে দেওয়া। বেতন চল্লিশ টাকা। একমাস চাকরী করার পর সায়েব জানিয়ে দিল যে পরের মাস থেকে ও, সি,-র আর কষ্ট করে অফিসে আসার দরকার নেই। ও, সি,-র মত লোক দিয়ে কোম্পানীর কাজ চলবে না। সুতরাং তাঁর প্রথম চাকরীর মেয়াদ একমাস।

১৯৩৯ সালে সমর দে (তখন ষ্ট্রোনাকের আর্ট ডিরেক্টর) আবার তদ্বির তদারক করে ও, সিকে ষ্ট্রোনাকে চাকরী দেন। কাজ হল একটি বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন অংশগুলি আঠা দিয়ে কাগজে সেঁটে বিজ্ঞাপনের চেহারায় দাঁড় করানো অর্থাৎ কমার্শিয়াল আর্টের পরিভাষায় যাকে বলে এ্যাসেমব্লিং। কিন্তু এবারও ও, সির বেশি দিন চাকরী করা ঘটে উঠল না। ১৯৪১ সালে যুদ্ধের বাজারে ষ্ট্রোনাক কোম্পানী দরজায় তালা দিল। ও, সি, আবার বেকার হলেন। ঐ বছরই যুধাজিৎ চক্রবর্তী (ছকুদা নামে পরিচিত) ও বারীন ঘোষ ষ্ট্রোনাক এ্যাডভারটাই-জিং-এর টেবিল চেয়ার নিলামে কিনে নিয়ে সার্ভিস এ্যাডভারটাইজিং নামে একটি এজেন্সি খোলেন। তাঁরা ও, সি'কে ওখানে নিয়ে যান। সেই সময় আর্ট-ইন-ইন্ডাষ্ট্রির প্রদর্শনীতে ও, সি,-র করা একটি মলাটের

ও, সি, অঙ্কিত লিপ্টনের বিজ্ঞাপন চিত্র।

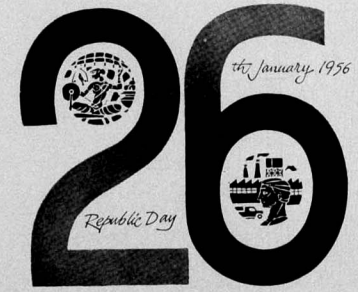

ডিজাইন দেখে স্বনামধন্য শিল্পী অন্নদা মুন্সী মহাশয় প্রীত হন এবং ও, সি,-কে ডি, জে, কিমারে আনবার জন্য তৎকালীন ম্যানেজার পিটার ব্রুমকে অনুরোধ করেন। সার্ভিস এ্যাডভারটাইজিংএ মাত্র একদিন চাকরী করার পর তিনি ডি, জে, কিমারে চাকরী পান।

ডি, জে, কিমারের ষ্টুডিয়ো বিভাগে অন্নদা মুন্সী তখন মধ্যমণি। তাঁর খ্যাতির সূর্য তখন মধ্য গগনে। ও, সি-র কিমারে এসে বড় লাভ হল—অন্নদা মুন্সীর সাহচর্য পাওয়া। ও, সি-র জীবনে এর মধ্যেই কয়েকবার চাকরী বদল হল বটে কিন্তু খুব একটা কিছু পদোন্নতি হল না। কিমারে এসে তাঁর কাজ হল কিছু কিছু লে-আউট ফিনিস করা এবং এসেমব্লিং। বেতন সাকুল্যে ষাট টাকা। সারাদিন ধরে কাঁচি দিয়ে কাটাকুটি আর আঠা দিয়ে জোড়াজুড়ি এবং অপরের কাজে কালি বুলনো। দীর্ঘদিন ধরে একটানা এই নীরস বুদ্ধি-হীন কাজ করে করে ও, সি-র মনে একধরনের হীন-মন্যতা জন্মে গিয়েছিল। তাঁর ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে আজীবন তাঁকে হয়ত এই কাজই করে যেতে হবে।

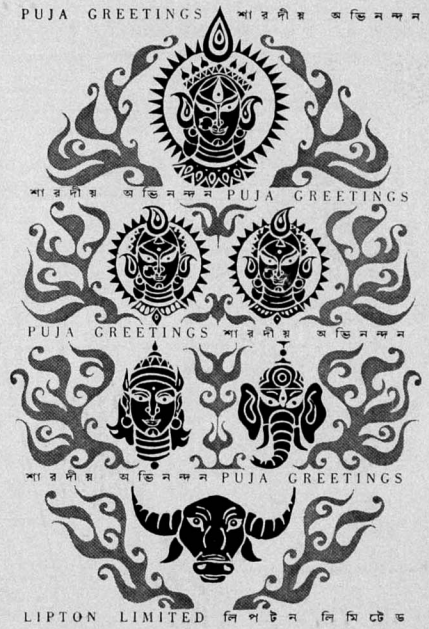

ও, সি, অঙ্কিত পুজার সময়কার একটি বিজ্ঞাপন চিত্র।

ও, সি, অঙ্কিত লিপ্টনের আরেকটি বিজ্ঞাপন চিত্র।

১৯৪৫ সাল ও, সি,-র জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৎসর। ঐ বছর বিখ্যাত শিল্পী সত্যজিৎ রায় (পরে চিত্রপরিচালক হিসাবে খ্যাত) কিমারে যোগদান করেন। নীরস কাজের চাপে শুষ্ক ও অবসন্ন ও, সি,-র মন একটি সমবয়স্ক সৃজনধর্মী টগবগে তাজা মনের সাহচর্য পেয়ে বেঁচে গেল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে শিল্প সম্বন্ধে নানা আলোচনা, ভাবের আদান প্রদান ও গল্পগুজবের মধ্য দিয়ে ও, সি,ও সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে একটি অকৃত্রিম সখ্য গড়ে ওঠে। আজ দুজনের সৃষ্টিক্ষেত্র ভিন্ন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পুরাতন সখ্যতা অটুট আছে।

ডি, জে, কিমারে থাকার সময়ই স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে ও, সি,-র প্রতিভা ক্রমশ বিকাশ লাভ করে। কিমারে চাকরী করার সময়ই তিনি তাঁর বেশিরভাগ বিখ্যাত বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেনগুলি রচনা করেছেন। ও, সি,-র জীবনে কিমারে চাকরী করার কয় বছর নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল।

বিজ্ঞাপনশিল্পী হিসাবে ও, সি,-র সার্থকতা বহুমুখী। ক্রিকেট খেলার জগতে অলরাউণ্ডার অর্থাৎ চৌকস খেলোয়াড় বলে যে একটা কথা আছে সেটা যদি কমার্শিয়াল আর্টের জগতে ব্যবহার করতে পারা যায়

ও, সি, অঙ্কিত খৃষ্টমাসের সময়কার একটি বিজ্ঞাপন চিত্র।

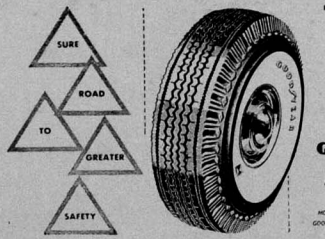

ও, সি, অঙ্কিত গুড-ইয়ারের একটি বিজ্ঞাপন চিত্র।

তাহলে ও, সি, গাঙ্গুলী একমাত্র শিল্পী যাকে বলা যেতে পারে চৌকস কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলা যাক। একটি পণ্যদ্রব্যকে পোষ্টার, খবরের কাগজ, সাময়িক পত্রপত্রিকা সিনেমা স্লাইড, প্রচারপুস্তিকা, উইণ্ডো ডিসপ্লে, হোর্ডিং প্রভৃতি নানা মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত করা, যেতে পারে। মাধ্যমের প্রকারভেদ ছাড়াও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে পরিকল্পনা, আইডিয়া, হরফ— লেটারিং, ছবি, ইলাষ্ট্রেশন প্রভৃতি অনেক কিছুর সমন্বয়ে একটি বিজ্ঞাপন রচিত হয়। প্রত্যেকটি অংশ ঐ ব্যাপারের স্পেশালাইজড্ শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত হয়। বিজ্ঞাপনের সব রকমের মাধ্যমে এবং একটি বিজ্ঞাপন রচনায় যত রকমের স্পেশালাইজড্ কাজ থাকতে পারে অর্থাৎ খসড়া পরিকল্পনা থেকে শুরু করে হরফ রচনা পর্যন্ত সব রকম কাজেই ও, সি, অসাধারণ দক্ষ এবং সিদ্ধহস্ত। এতখানি হওয়া একদিনের কাজ নয়। প্রতিভার সঙ্গে নিরন্তর অনুশীলন এবং কঠোর শ্রমশীলতা তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে এমন একটা সম্পূর্ণতা এনে দিয়েছে যার ফলে একথা বোধ হয় বলা যেতে পারে ভারতীয় বিজ্ঞাপনশিল্পের ক্ষেত্রে ও, সি, গাঙ্গুলী অদ্বিতীয়। কিন্তু

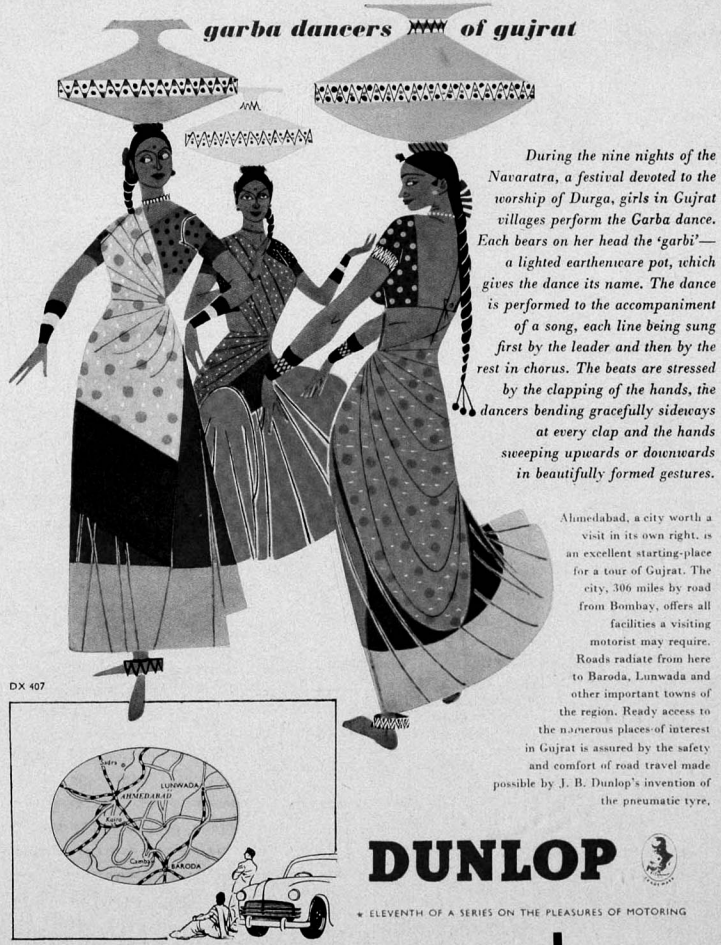

ও, সি-র আঁকা বিজ্ঞাপন-চিত্রের নিদর্শন

spring dances of nagas

Each year during the spring festival, tiny villages nestling among the Naga Hills in Assam resound with the beating of drums and the singing of traditional tribal chants. Decked in full war-paint, Naga menfolk run through a rich repertory of dances, mostly martial in character. Slender Naga maidens, liberally adorned with bead necklaces, brass bangles, and amulets, dance before the village chief's house, swaying hand in hand for hours on end to the accompaniment of charming melodies.

* * *

Kohima, administrative headquarters of the Naga Hills area gives ready access to the entire region. It is linked by road with Gauhati through Nowgong and Bokakhat. The stretch between Golaghat and Kohima is motorable in the dry season. Kohima has an inspection bungalow, and petrol is also available here.

A visit to the colourful Naga Hills is a pleasure brought within the reach of all by the safety and comfort of road travel assured by John Boyd Dunlop's invention of the pneumatic tyre.

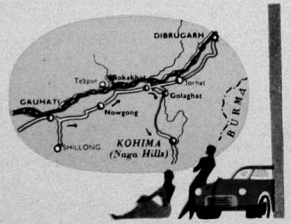

DUNLOP

* NINTH OF A SERIES ON THE PLEASURES OF MOTORING

DX 405.

ও, সি-র আঁকা বিজ্ঞাপন-চিত্রের নিদর্শন

ও, সি-র আঁকা বিজ্ঞাপন-চিত্রের নিদর্শন

Tanjore's dummy horse show

Tanjore, the home of Bharata Natyam, is also famous for its dummy-horse show, performed during the year-end festive season. Drawing upon mythology for themes, the dances—an intricate pattern of expressive movements and gestures—are performed to the accompaniment of classical music. The brilliantly coloured horses may weigh up to 1½ maunds, and the performance, often running to several hours, calls, therefore, not only for great skill but also much stamina.

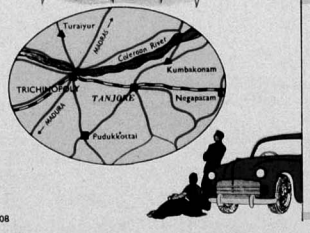

Tanjore is 34 miles east of Trichinopoly which stands 248 miles down south on the road leading from Madras to Cape Comorin. Both accommodation and petrol are available in Tanjore.

A visit to the scenes of India's famous festivals ranks high among the pleasures of motoring, made possible by John Boyd Dunlop's invention of the pneumatic tyre.

DUNLOP

* TWELFTH OF A SERIES ON THE PLEASURES OF MOTORING

DX408

ও, সি-র আঁকা বিজ্ঞাপন-চিত্রের নিদর্শন

তবুও এটা হল তাঁর প্রতিভার কারিগরী দিক। এ ছাড়া বিজ্ঞাপনশিল্পে শিল্পী হিসাবে তাঁর একটি মহত্তর ভূমিকা আছে।

এ সম্বন্ধে কিছু বলার আগে ও, সি,-র শিল্পীমনের বিবর্তন সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার। বিজ্ঞাপনশিল্পী হিসাবে ও, সি,–র কাজের মধ্যে দুটি সুস্পষ্ট পর্যায় দেখা যায়। প্রথম দিকে ও, সি,–র কাজের মধ্যে বেশি মাত্রায় বিদেশী ছাপটা প্রকট ছিল। দীর্ঘদিন ধরে বিদেশী বিজ্ঞাপন শিল্পের ধারায় কাজ করতে করতে ও, সি, ক্রমশ অনুভব করেন যে বিজ্ঞাপনের কাজে বিদেশী বিজ্ঞাপনগুলিকে দক্ষতার সঙ্গে অনুকরণ করতে পারাটাই আমাদের দেশের বিজ্ঞাপনশিল্পের শেষ কথা হওয়া উচিত নয়। কোথায় একটা বড় ফাঁক থেকে যাচ্ছে। বিজ্ঞাপন রচনায় ভারতীয় ভাব

ও, সি, অঙ্কিত স্ট্যাণ্ডার্ড ভাকুয়ামের একটি বিজ্ঞাপন চিত্র।

ও, সি, অঙ্কিত একটি ওষুধের বিজ্ঞাপন চিত্র।

আনা দরকার। কথাটা ভাবা সহজ কিন্তু কাজে করা খুবই কঠিন।

দেশী ভাবটা শুধু বিষয়বস্তুতে থাকলেই চলবে না, ড্রইং–ট্রিটমেন্ট এবং কম্পোজিশন–রীতিতেও দেশীয় ভাব থাকা দরকার। এ কথার তাৎপর্য হল এই যে সমসাময়িক বিজ্ঞাপনে মেমসাহেবদের কেবল শাড়ি পরিয়েই ভারতীয় করার চেষ্টা করা হত। বিজ্ঞাপন-শিল্পে ভারতীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করবার যে বিমূর্ত আইডিয়াটা ও, সি,–র মনে ছিল সেটার প্রথম প্রকাশ–প্রচেষ্টা হয় তাঁর 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েসের' জন্যে করা কতকগুলি

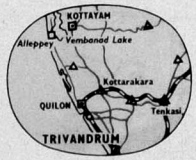

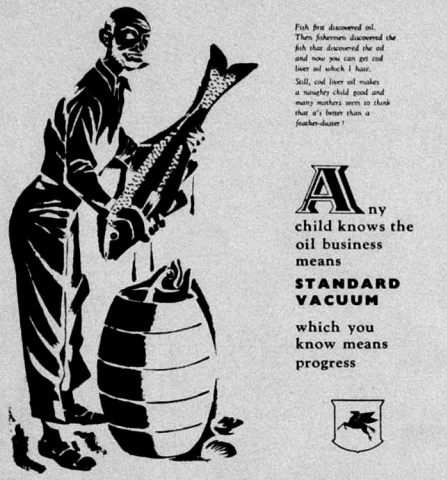

ও, সি, অঙ্কিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়ামের আরেকটি বিজ্ঞাপন চিত্র।

বিজ্ঞাপনে। 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েসের' একটি শারদীয় বিজ্ঞাপনে ও, সি,–আঁকলেন আকাশে লঘু মেঘ, আঁকাবাঁকা নদীপথে মাঝি নৌকা বেয়ে আসছে, শিউলি গাছের তলায় শিউলিফুল বিছিয়ে আছে, মেয়েরা আঁচলে করে সেগুলি কুড়িয়ে নিচ্ছে। শুধু বিষয় বস্তুর দিক থেকেই নয় ড্রইং–এর ধরন, পার্‌স্পেকটিভ্ প্রভৃতি সব কিছু মিলিয়ে বেশ একটা দেশী আবহাওয়া। এর পর থেকে ও, সি, সুযোগ মত বহু বিজ্ঞাপনচিত্রে দেশী ঢঙের ব্যবহার করতে থাকেন। ও, সি,–র শিল্প-জীবনের এটা একটা নব পর্যায়। বিজ্ঞাপনচিত্রে দেশী ভাব আনবার চেষ্টাটাই কিন্তু বড় কথা নয়, কারণ বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুতে বা ইলাষ্ট্রেশন-এ ভারতীয় ধরন চালাবার চেষ্টা হয়ত ও, সি, ছাড়া আরও দুএকজন করেছেন বা করছেন কিন্তু তাঁদের সকলের কাজের সঙ্গে ও, সি,–র কাজের সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। বিজ্ঞাপনে দেশী ঢং আনতে গিয়ে নানা পরীক্ষা–নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ও, সি, এমন একটা বিচিত্র দৃষ্টিকোণ এবং প্যাটার্ন আবিষ্কার করেছেন যেটার মধ্যে ভারতীয়তার ছাপ থাকা সত্ত্বেও আছে তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব ইন্টারপ্রিটেশন। ফলে দেশী ভাব আনতে গিয়ে তাঁর কাজ কোথাও ভারতীয় কম্পোজিশন পারস্পেক্‌টিভ বা ড্রইং, প্যাটার্নের নিছক অনুকরণ বা চর্বিতচর্বণ হয়ে দাঁড়ায়নি। মানুষজন, গাছপালা, পশুপক্ষী নানা শিল্পবস্তু তাঁর ছবিতে যতখানি না ভারতীয় তার চেয়ে বেশি স্বকীয় হয়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর ডানলপের রঙিন বিজ্ঞাপনগুলি ধরা যেতে পারে। গরবা নৃত্যের নৃত্যপরা মেয়েগুলির ছন্দিত দেহভঙ্গীতে বেশভূষায় প্যাটার্ন মেকিং এবং কালার স্কিমে ভারতীয় শিল্পরীতির সুস্পষ্ট ছাপ আছে। টাইপের দিক থেকে আঞ্চলিক সব রকম বৈশিষ্ট সমেত ওরা গুজরাট প্রদেশবাসিনী কিন্তু তবুও যেন কোন দেশ-বিশেষের মেয়ে ওরা নয়। শিল্পকারের সৃষ্ট নিজস্ব এক জগতের মেয়ে ওরা। তেমনি নাগা নৃত্যের নাগারা বা উপকূলের জেলে জেলেনীরা একটা বিশেষ অঞ্চলের টাইপ হিসাবে অঙ্কিত হওয়া সত্ত্বেও তারা যেন অন্যতর কোন এক জগতের প্রাণী। ও, সি,–র এই ধরনের শিল্প প্রচেষ্টাগুলি কোন একটি দেশবিশেষের শিল্পরীতির দ্বারা চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও সীমিত নয়।

এই প্রসঙ্গে আরও কিছু বলার আছে। ফাইন আর্ট এর ক্ষেত্রে শিল্পী একেশ্বর। বাধাবন্ধহীন নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী সে কাজ করতে পারে। বিজ্ঞাপন শিল্পে বিপরীত আচার। এখানে শিল্পীকে সহস্র নিয়ম কানুন বাধানিষেধের চোখ রাঙানিকে মেনে চলতে হয়। তাই সহস্র সীমাবদ্ধতার মধ্য থেকে বিজ্ঞাপনশিল্পীদের কাজ নন্দনশাস্ত্র অনুযায়ী শিল্পমর্যাদা পাওয়া দুঃসাধ্য।

ও, সি, অঙ্কিত বিজ্ঞাপনের অপর একটি নমুনা।

পরিকল্পনায় গতানুগতিকতা, বিজ্ঞাপনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে শিল্পবস্তুর নির্বিচার ও নির্বোধ সিপ্লিফিকেশন এবং প্রকাশভঙ্গীতে কল্পনার অভাব ও কমার্শিয়াল আর্টের ক্রেতাদের মূর্খতা আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনশিল্পকে এবং বিজ্ঞাপন শিল্পীদের হেয় করে রেখেছে। এই সব নানা কারণে আমাদের দেশের বিজ্ঞাপনশিল্পীর পক্ষে শিল্পীর মর্যাদা সৃষ্টীর মর্যাদা পাওয়া অতীব কঠিন। বিজ্ঞাপনশিল্পী হিসাবে ও, সি,–র সার্থকতা বিচার করতে গেলে বলতে হয় তিনি সৃষ্টার মর্যাদা পেয়েছেন এবং বিজ্ঞাপনের যে একটা শৈল্পিক মূল্য থাকতে পারে তার প্রতি জনসাধারণ ও রসবেত্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিজ্ঞাপনশিল্পকে মর্যাদা দান করেছেন।

বিজ্ঞাপনের কাজ ছাড়া ও, সি, অফিসের কাজের পর নিজের ষ্টুডিয়োতে নিয়মিত ফিগার ষ্টাডি করেন। নিছক ছবি আঁকার দিকেও তাঁর প্রচুর আগ্রহ এবং অবসর মত ছবি আঁকেন। অদূর ভবিষ্যতে নিজের আঁকা ছবির প্রদর্শনী করবার ইচ্ছা রাখেন। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য অভ্যাসের কথা উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। স্বনামধন্য শিল্পী আর্টিজান যখন কলকাতায় আসেন তখন ও, সি,–র সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তাঁর পরামর্শমত ও, সি, রোজ রাত্রে বাড়ি ফিরে গিয়ে শোবার আগে সারা দিনের যে কোন একটি ঘটনা মেমরী থেকে স্কেচ করেন। তাঁর এই উল্লেখযোগ্য অভ্যাসটির একদিনও ব্যতিক্রম হয় না।

ব্যক্তিগত জীবনে ও, সি, অত্যন্ত বন্ধুবৎসল সদালাপী ও বিনয়ী। সব সময়ে প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনা না থাকলেও তিনি পরিচিত বা বন্ধুজনদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন না এবং তাদের কাজ করে দেন।

ও, সি, অঙ্কিত আর একটি বিজ্ঞাপন চিত্র।

এ ছাড়া বহু ছোটখাট বিজ্ঞাপন এজেন্সি তাঁর ওপর ভরসা করে চলে। সকলের প্রতিই তাঁর সমান দাক্ষিণ্য এবং একজন শিল্পী কি করে এতগুলি বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ীকে সাহায্য করেন তা ভাবতেও বিস্ময়!

বিভিন্ন দেশের পুতুল সংগ্রহ করা ও, সি,–র হবি। বর্তমানে ও, সি, 'প্রেস-সিণ্ডিকেট' নামক এ্যাডভারটাইজিং প্রতিষ্ঠানের আর্ট ডিরেক্টর। এ ছাড়া পাটনা আর্ট স্কুলের কমার্শিয়াল আর্টের পেপার-সেটার ও একজামিনার।

বাংলার পুরাতন কাঠখোদাইচিত্রের শৈলীতে ও, সি, অঙ্কিত একটি বিজ্ঞাপন চিত্র।

ত্রিবাঙ্কুরের কাঠখোদাইয়ের কাজ

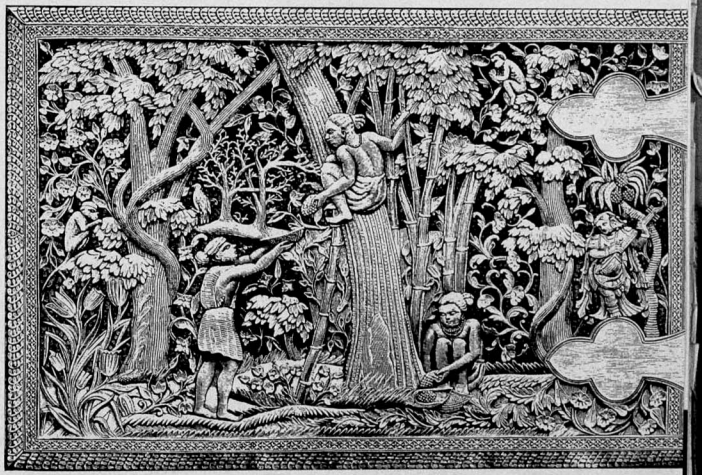

ভারতের কাঠখোদাই শিল্প

জি, ভেঙ্কটাচলম

ভারতীয় কলাবিদ্যার খণ্ডভাবে অনুশীলন বাঞ্ছনীয় নয়, সমালোচকের সুবুদ্ধিতে এই কথাই বলে। সকল কলাবিদ্যার একীভূত সমন্বয়ের কথা স্বভাবতঃই সমালোচকের মনে পড়ে, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রেও জীবন সম্বন্ধে সেই এক কথা—সমন্বয়ের সুর খুঁজে বেড়ানো। প্রকৃত কলাবিদ্যার কাজই হ'লো একান্ত ভাবে সেই সুরের অন্বেষণ, শিল্পীর মৌলিক অভিপ্রায় বুঝতেও এই অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আবশ্যক।

পাথর খোদাই ও কাঠখোদাই শিল্পের মধ্যে যেমন বিভেদ বৈষম্য, তেমনি পরস্পরের প্রতি প্রভাব বিস্তারের আগ্রহ এবং স্বার্থের সম্বন্ধ বর্তমান। ভারতীয় কোন শিল্পের মধ্যে এমনটি আর দেখা যায় না। কাঠখোদাই শিল্প শুধু প্রাচীন বলে নয়, প্রকাশে ও পরিস্ফুটনের মান সবচেয়ে উন্নত বলে, এতে শিক্ষণীয় বিষয় অনেক আছে।

সত্যিকথা বলতে কি, হিমালয় থেকে কুমারিকা

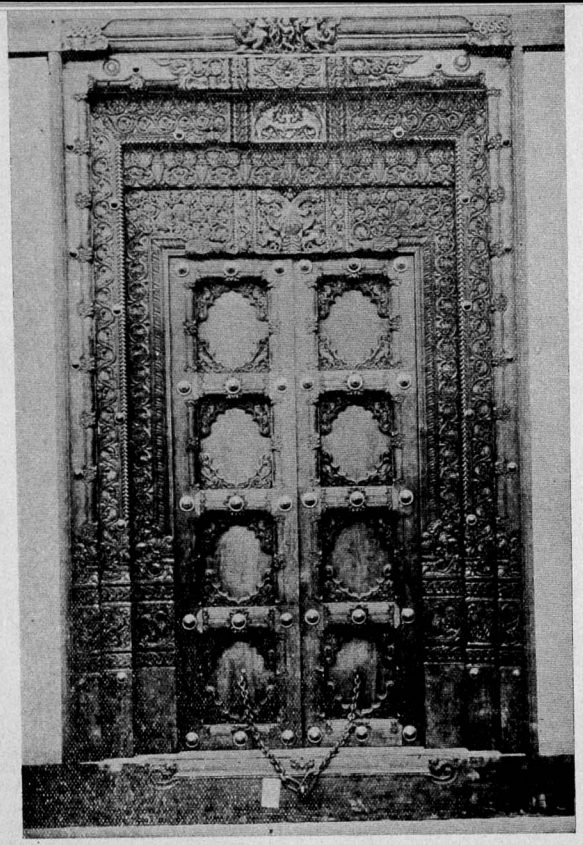

দাক্ষিণাত্যের একটি খোদাই-করা কাঠের দরজা।

অন্তরীপ পর্যন্ত শাখায় প্রশাখায় এর বিস্তৃতি, আকৃতি ও গঠনে স্থানীয় প্রভাব থাকলেও খোদাই শিল্পের মূল সুর এক। ভারতীয় শিল্পকলার সামগ্রিক রূপ-সৌন্দর্য এবং তার বহুধাবিস্তৃত ক্রমোন্নতির বিষয় সঠিকভাবে অবহিত হতে হলে কাঠখোদাই শিল্পের ইতিহাস অনুশীলন অনেক তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করবে। এর প্রাচীনত্ব, প্রত্নতত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসুদের ঐতিহাসিক কাল নির্ণয়ে উৎসাহিত করবে, এর নিহিত ধর্মভাব, ধর্মপ্রাণ

ব্যক্তিদের মনে সাড়া দেবে, এর মনোহর শিল্পনৈপুণ্য, জাতির বৈশিষ্ট্য, উদ্‌ঘাটিত করবে।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিদ্যার বিভিন্ন নক্সার ক্রম-বিকাশের ধারা, ভারতের কাঠখোদাই শিল্প অনুশীলন করলেই বিশেষভাবে জানা যাবে, শুধু তাই নয়, সমাজ ও ধর্মের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের প্রকৃতি ও আকারের রূপান্তর পরিলক্ষিত হবে।

যখন কেউ ভারতীয় শিল্পকলার প্রগতি অথবা বিবর্তনের কথা বলে, তখন একথা নিশ্চিতই মনে হবে যে আর্টের অনুশীলনের অর্থ আদিকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় নয়। অন্য দেশের শিল্পকলা সম্বন্ধে যে কথাই হোকনা কেন, ভারতীয় ললিতকলার উৎপত্তিকাল সম্বন্ধে সঠিক কেউই পরিচয় দিতে পারে না। অন্য সব বিষয়ের মত ভারতীয় শিল্পকলার সূচনার কাল পুরাতত্ত্বের কুয়াশায় অস্পষ্ট, ভারতীয় শিল্পকলার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের অনুশীলনের অর্থ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাকে উপলব্ধি করা। ভারতীয় ললিতকলার জন্মকাল তিন হাজার বছরেরও আগে বলা যেতে পারে।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা ভারতের প্রাচীন সহরের ধ্বংস-স্তূপ থেকে যে সব জিনিষ আবিষ্কার করেছেন, যার কিছু নমুনা স্যার অরষ্টেন টেরিয় বেসিনের ঢালু জায়গার প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করেছেন, সেই সব নমুনাই কাঠখোদাই শিল্পের আদিম নিদর্শন বলা যেতে পারে। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় বৌদ্ধ শিল্প-কলার জন্মভূমি ভারতবর্ষ। এই পুণ্যভূমি থেকেই একদিন তা দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীন সাহিত্যে কাঠখোদাই কাজের শিল্প হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে কিন্তু নশ্বর বলে সে সময়ের কাঠখোদাইয়ের কোন নমুনা এখন আর দেখা যায় না।

মধ্যযুগে বিশেষ করে মোগল রাজত্বের সময়ে, সাংসারিক প্রয়োজনে কাঠের ব্যবহারের প্রচলন ছিল। কাঠের চারপাশে নানাবিধ কারুকার্য-করা অলঙ্কার রাখার আধার, চৌকি, আলমারি প্রভৃতি জিনিষ, গৃহস্থের ঘরে সজ্জিত থাকত, রাজপ্রাসাদে কাঠের চেয়ার ও সিংহাসন দেখা যেত। রাজপুতানার রাজা মহারাজার বাড়িতে এখনও তার কিছু চিহ্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। সেই সময়ে অঙ্কিত চিত্রসমূহ মনোযোগের

উত্তর ভারতের কাঠের খোদাই কাজের কয়েকটি নমুনা।

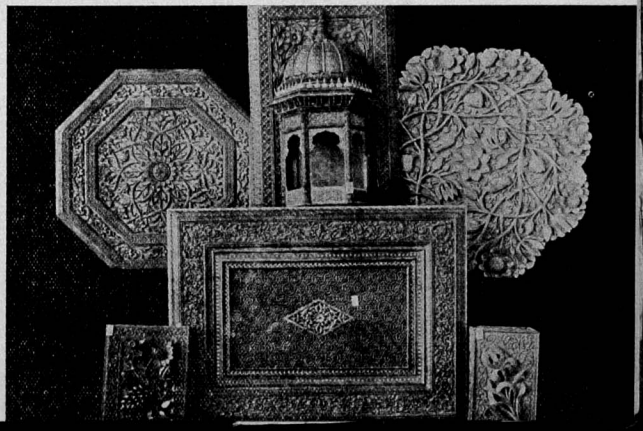

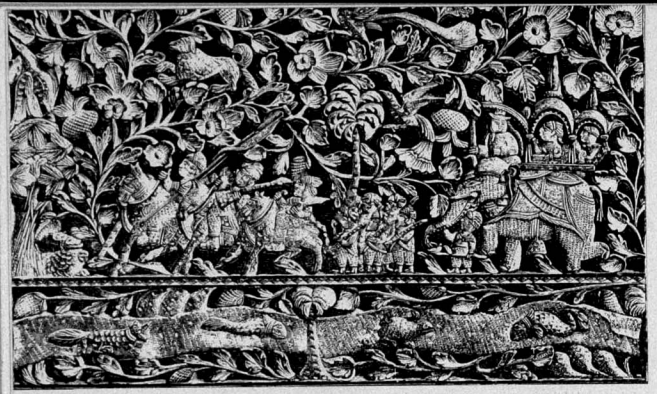

আমেদাবাদের একটি কাঠখোদাই।

সঙ্গে পরীক্ষা ও অনুশীলন করলে এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়।

বহু শতাব্দীর সংঘাতে অবিচলিত এই শিল্প। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে কাঠখোদাই শিল্পের আশ্চর্য সৃজনীপ্রতিভার স্বাক্ষর এখনও ভারতের নানা স্থানে, বাড়ির অঙ্গসজ্জায় সম্মুখের সিংদরজায় বিশেষভাবে পরিস্ফুট। গুজরাটে, পাঞ্জাবে এর নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। সুরাট, বরোদা, আমেদাবাদ, অমৃতসরের রাস্তায় চলতে চলতে কাঠখোদাইয়ের কাজ সব সময়ই চোখে পড়বে। এর কারিগরি-নৈপুণ্য, গুণের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করতে কারও দ্বিধা হবে না।

আধুনিক যুগে কাঠখোদাইয়ের কাজ পাঞ্জাব, গুজরাট, মালাবার, মহীশূর ও রাজপুতানায় বিশেষভাবে চোখে পড়ে। উত্তরপ্রদেশে কাঠের যে-সব বড় বড় দরজা জানালা তৈরী হয় সেগুলো খুব ভারী, আয়তনে বৃহৎ বলা যেতে পারে। নাগপুরে দাক্ষিণাত্যের অনুকরণে কাঠের ওপর অনেক কারুকার্য দেখা যায় কিন্তু সেগুলো নিছক অনুকরণ, মৌলিকত্ববর্জিত বলে, ভাল লাগে না।

বাংলাদেশে, কাঠখোদাই শিল্পের বিশেষ প্রচলন নেই, উল্লেখযোগ্য সেরকম কোন কারিগরও নেই। নেপাল

কানাড়া অঞ্চলের একটি কাঠখোদাই।

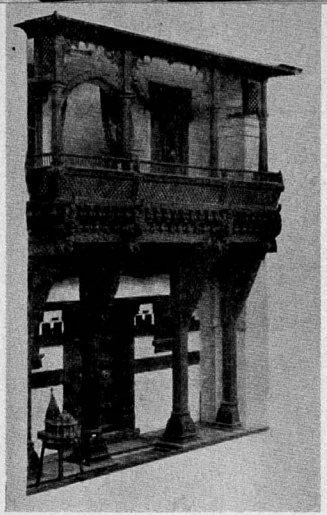

গুর্জরপ্রদেশের একটি কাঠের উপর খোদাইকরা সম্পূর্ণ বারান্দা।

লার খড়খড়ি, বারান্দার স্তম্ভ, দরজার আবরণীর মধ্যে, কাঠখোদাইয়ের কারুকার্য করা হয়, এই সূক্ষ্মকাজ শিল্পের অপরূপ নিদর্শন হিসেবে সকলের মনোরঞ্জন করে। গবাক্ষের অগ্রস্থিত সচ্ছিদ্র কারুকার্য, কাঠের ওপর সচিত্র ফুল-খোদাইয়ের কাজ, সুনিপুণ দক্ষতার পরিচয় দেয়। এই সব গুণী শিল্পীরা সকলের সম্ভ্রম অর্জন করেছেন; তাঁদের হাতের কাজ বাস্তবিকই সুন্দর। কাঠখোদাইয়ের কাজে ভারতের মধ্যে গুজরাটই প্রখ্যাত

ব্রহ্মদেশে, কাঠের সূক্ষ্ম কারুকার্যের প্রাচুর্য অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু ওদের কাজের ওপর চীনদেশীয় প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে। পাঞ্জাবে কাঠখোদাই কাজের প্রধান কেন্দ্র অমৃতসর, লুধিয়ানা, জলন্ধর এবং পেশোয়ার। জ্যামিতিক ভিত্তিতে কাঠের অংশ বিচ্ছিন্ন করে সাধারণত সমতলক্ষেত্র থেকে ওপরের দিকে মসৃণভাবে কাঠখোদাইয়ের কাজ করা হয়। কাশ্মীরের কাজ সরল এবং বক্ররেখার সমন্বয়ে ক্ষমতাশালী, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানের কারিগরেরা কাঠের ওপরে বাস্তবতার রূপ খোদাই করছেন। কাঠখোদাইয়ের কাজে বেগুন, শিসাম, দেওদার, আখরোট, আবলুস কাঠ ব্যবহার হয়।

হিমালয়ে এখনও হিন্দু কারিগরদের কাজের মধ্যে, কাঠখোদাইয়ের শুদ্ধ পরিচ্ছন্ন দিকটি লক্ষিত হয়, কিন্তু এঁরা তিব্বত বা চীনের নমুনা অনুকরণ করে চলেছেন, রাজপুতানায় সাধারণত জানা-

গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাঠখোদাইয়ের কাজে ব্যস্ত ভারতীয় শিল্পীদের একটি রেখাঙ্কনচিত্র।

খোদাই কাজে রত
পাঞ্জাব প্রদেশের জনৈক কাঠখোদাই শিল্পী।

বলা চলে, যদিও এই শিল্প এখনও সেখানে বেঁচে আছে, তবে ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আমেদাবাদ এবং সুরাটে জৈন কারিগরদের খোদাই প্রণালী পুরাকালের পাথর-খোদাই নমুনার অনুকরণ বলা যেতে পারে। একাদশ শতাব্দীতে উত্তরভারতে যখন জৈন শিল্পকলা উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছিল সেই সময়ে আবু, গিরনার, সদনীরের সুন্দর মন্দির তৈরী হয়, এই শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য অনুভূত হবে এইসব মন্দিরের প্রবেশদ্বারের অর্ধ গোলাকৃতি খিলানে, যা চক্রবালের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে মিশে গেছে, একটির পর একটি খিলানের স্তর ক্রমশ এগিয়ে মধ্যস্থলে সংযুক্ত হয়েছে। কাঠখোদাইয়ের অলঙ্কারের প্রকৃতি এবং ধারা দেওয়াল-গিরির বন্ধনীর কাজের মধ্যেই পরিস্ফুট। পরবর্তী কারিগরেরা বংশপরম্পরায় এরই অনুকরণ করে চলেছে, গুজরাটের হিন্দু শিল্পীর কাঠখোদাইয়ের বিশুদ্ধ নিদর্শন ভবনগরের রাজপ্রাসাদের একাংশে এখনও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এই সব ললিতকলার সৌন্দর্য এবং মাধুর্য না দেখে উপলব্ধি করা যায় না। এর পরেই কাঠখোদাইয়ের কাজে মহীশূরের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বেলুড়, হালেবিদ এবং সোমনাথপুরে মন্দিরের প্রাচীরে চন্দনকাঠে অনেক মূর্তি খোদাই দেখতে পাওয়া যায়। স্তম্ভের খিলান এবং মন্দিরের দরজায় বিচিত্র কাঠখোদাইয়ের কারুকার্য বর্তমান কালের কারিগরেরা সুনিপুনভাবে অণুকরণ করে অতীতের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। অম্বভিলার দরবার হলের অভ্যন্তরে, এবং মহীশূর রাজপ্রাসাদের দশরা হলের দরজায়, কাঠখোদাইয়ের সূক্ষ্ম কারুকার্যের চমৎকার নিদর্শন রক্ষিত আছে, বলা যেতে পারে। দরজার কাঠামোর ওপর কার্ণিশের অংশে, লতায় পাতায় পুষ্পে সজ্জিত রয়েছে পৌরাণিক যুগের জীবজন্তু;

পুষ্পের অলঙ্কারে আর দাক্ষিণ্যে লাবণ্য এবং সুষমা, ছড়িয়ে পড়েছে।

বেলুড় মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপর যেমন পাথর খোদাইয়ের কাজ আছে ঠিক অবিকল সেইরকম পাক-দেওয়া পালক এবং পাখার মত বিস্তৃত পত্রগুচ্ছ, মহীশূরের কাঠখোদাই কারুকার্যের প্রধান নিদর্শন হিসেবে পরিচিত। শিল্পীর অনুশীলন ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন। কেউ হয়ত সরলভাবে সমতলপৃষ্ঠ থেকে খোদাই করছেন, কেউ হয়ত গভীরভাবে ক্ষোদিত করে নক্সা তুলছেন। এসব কাজে চন্দন, দেবদারু, কাঁঠাল কাঠের ব্যবহার বেশি। প্রধানত সীমোগা জেলায়, মাত্র কয়েকঘর কারিগর পরিবারের মধ্যে কাঠখোদাই কাজের অনুশীলন চলছে, দুঃখের বিষয় সরকারের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত তারা বিশেষ উৎসাহ পায়নি। এই সব কারিগরের ব্যবহারের যন্ত্রপাতিও অল্প এবং সাধাসিধে। রেঁদা, করাত, কাঠের ছোট মদ্‌গর, ছোট বড় বাটালী, খোদাইয়ের যন্ত্র ইত্যাদি, এই সব যন্ত্রপাতি সূক্ষ্ম হলেও স্থানীয় লোকেরাই তৈরী করে। কাঠখোদাইয়ের কাজের প্রণালীও বেশ সহজ। প্রথমে নমুনা কাগজে আঁকা হয়, তারপর নমুনা অনুযায়ী কাঠের ওপর প্রথমে একটা নক্সা করা হয়। তারপর কেটে কেটে নমুনা তোলা হয়। ছোট বড় বাটালীর সাহায্যে সূক্ষ্ম কাজও সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। এইভাবে আলোছায়ার দোলা, বক্ররেখা, নানারকম ভাবপ্রকাশ বিভিন্ন গঠন ভঙ্গীতে পরিস্ফুট করা হয়। গুজরাট এবং মহীশূরের শিল্পীদের মধ্যে পার্থক্য, তাদের গঠন ভঙ্গী বা আদর্শে নয়; পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অলঙ্কারণের বৈশিষ্ট্যে গুজরাটে অলঙ্কারের ক্ষেত্র বিস্তৃত এবং প্রগল্‌ভ খুঁসীমত কাঠ কেটে খোদাই করা হয়, প্রচলিত রীতি বা মনোহরভাবে সাজানোর আগ্রহ চোখে পড়ে না। মহীশূরে অলঙ্কারের ক্ষেত্র পক্ষাকৃতি, পাখার মত সামনের অংশ গুটানো। পৌরাণিক চিত্রাবলী সুন্দরভাবে নক্সায় তোলা। দেবদেবীর মূর্তির প্রাধান্য মহীশূরের কাঠখোদাইয়ের কাজে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। জগনমোহন চিত্রশালায় মহীশূরের কাঠখোদাই শিল্পের একটি চমৎকার নিদর্শন সংগৃহীত আছে।

কাঠখোদাই শিল্প, পাথর-খোদাই শিল্প, চিত্রকলা, সঙ্গীতবিদ্যা এবং স্থাপত্যশিল্প জাতির সম্পদ। এইসব শিল্প যেমন আদর্শ এবং সৌন্দর্যের অনুশীলন করে তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এদের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায়না। শিল্পপ্রতিভায় উজ্জ্বল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টির বৈচিত্র্য আছে, তার মধ্যে তারতম্য আবিষ্কার করা অসম্ভব মনে হয়। জাতির জীবনে শিল্পীর একটি বিশেষ সম্মানজনক স্থান আছে। সেখানে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে যেখানে সে সুখে নীড় বাঁধবে। তার সৌন্দর্যের আদর্শে পৃথিবী সুন্দর এবং পবিত্র হবে। ভারতের নব অভ্যুদয়ের দিনে প্রত্যেক শিল্পীরই সমান অধিকার থাকবে, সকলেই সমান সুযোগ পাবে, কেউই পিছনে থাকবে না। অন্ততঃপক্ষে স্বাধীন ভারতে এই কথাই আমরা স্বপ্ন দেখে থাকি।

সুভো ঠাকুরের সংগ্রহের শতাধিক বছর আগেকার বাংলাদেশের কাঠের খোদাইকরা একটি লম্বা পাটাতন। হাতির মুখ এবং পাখির দেহ—নক্সার অভিনবত্ব লক্ষণীয়।

কুকুভা রাগিণী (অভিসারিকা)

রাগ-রাগিণীর চাক্ষুষ-চিত্র

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষের মনে এমন অনেক অনির্বচনীয় ভাব ও কথা আছে যা অভিধানের কথার সাহায্যে প্রকাশ করতে পারি না। এই সমস্ত অনির্বচনীয় ভাব ও বস্তুর প্রকাশের জন্য আমাদের আশ্রয় নিতে হয় চিত্রশিল্পের বা রূপ-রেখার ভাষার। সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্র,কথাশিল্প, সুরশিল্প ও রূপশিল্প এক একটি স্বতন্ত্র স্ব-স্ব-প্রধান মানুষের মনের কথা প্রকাশ করবার বিভিন্ন রীতি ও বিভিন্ন আঙ্গিকের ভাষা। বিভিন্ন সাধনায় এর প্রত্যেকটিই বিশেষ উপকারী বন্ধু। এই বিভিন্ন সাধনার বাহনের মধ্যে কাউকেও উপেক্ষা করা যায় না।

সকল যুগের শ্রেষ্ঠ সাধনার মূলে এই স্ব-স্ব-প্রধান মানুষের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে একটা সহযোগিতার বন্ধন ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে, পুঁথির পাতা কেবল অক্ষরেই ভরে উঠত তা নয় তার সঙ্গে চিত্র সংযুক্ত করে দিয়ে বক্তব্য কথা বা বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে হৃদয়-গ্রাহী করে তোলা হত। সুরশিল্পের সঙ্গেও রূপ-শিল্পের একটি নিবিড় ও অঙ্গাঙ্গী যোগসূত্র ছিল। এই যোগ সিদ্ধিলাভ করেছে আমাদের রাগ-রাগিণীর চাক্ষুষ

মূর্তি-কল্পনায়। প্রত্যেক রাগ ও রাগিণীর স্বর-রূপের অনুরূপ ও উপযোগী চাক্ষুষ রূপ-কল্পনা ও নানা রস-রূপের চাক্ষুষ প্রতিকৃতি অবলম্বন কোরে এক একটি রাগ ও রাগিণীর রস-সত্তার ব্যাখ্যান কোরে দিয়েছেন ভারতের চিত্রশিল্পীরা। এই যে শ্রাব্য বস্তুকে চক্ষু-গ্রাহ্য রূপ বা তস্‌বীরে অনুবাদ করা হয়েছে তার জন্য চিত্র-শিল্পীদের স্বাধীন কল্পনা দায়ী নয়।

আমাদের প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রের ঋষিরা নিজেরাই এই পথ দেখিয়ে দিয়েছেন—প্রথমে এক একটি রাগিণীর বা রাগদের ধ্যানশ্লোক রচনা কোরে। সঙ্গীতশাস্ত্রে এর প্রথম প্রমাণের সন্ধান পাওয়া যায় সোমনাথ রচিত "রাগ-বিবোধ" গ্রন্থে (১৬০৯ খৃঃ অব্দে)। খুব 'রাগ-বিবোধ' গ্রন্থে এই ব্যাপারটি প্রথম লিপিবদ্ধ হয়েছে এইমাত্র।

'পঞ্চমবিবেক' অধ্যায়ে (১৬৮ শ্লোকে) গ্রন্থকার বলছেন, পূর্বে নানা রাগের সম্বন্ধে তত্তৎ রাগের বিভিন্ন 'নাদময়' (অর্থাৎ শ্রাব্যময়) রূপের কথা বলেছি—অতঃপর এইখানে তাদের এক একটি রাগের 'দেবতা-ময়' রূপের কথা বলছি। সেই সেই বস্তুকে রাগের 'রূপ' বলা যায় যা যা সুমিষ্ট স্বর দ্বারা বিশিষ্টরূপে উদ্ভাসিত হয়ে আমাদের মনের সম্মুখে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায়। এই 'রূপ' দুই প্রকারের :- 'নাদময়' (শ্রাব্য) এবং 'দেব-দেহময়' (দৃশ্য) রূপ। নাদময় রূপের অবয়ব স্বর বা শ্রাব্য শব্দ এবং দেবময় রূপের

রামকেলী রাগিনী

বসন্ত রাগ

হিন্দোল রাগ

সম্ভবত এই চাক্ষুষ-রূপ কল্পনা ব্যাপারের প্রথম প্রয়োগ হয় 'রাগ-বিবোধ' গ্রন্থের বহু পূর্বে। কারণ সঙ্গীত-রত্নাকর গ্রন্থে এক একটি রাগের বিশিষ্ট 'আরক্ষ-দেবতার' উল্লেখ আছে। কিন্তু, 'রাগ-বিবোধ' গ্রন্থের পূর্বে ছন্দে গাঁথা ধ্যান-শ্লোকের নিদর্শন বড় কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের বলতে হয় যে অবয়ব ঐ রাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার চাক্ষুষ রূপ (তস-বীর)। রাগের নাদময় রূপ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে, এইবার দেবতাময় রূপ সম্বন্ধে একে একে বলা হবে। ব্যাপারটি এই যে, সঙ্গীতশাস্ত্রকারদের মতে প্রত্যেক রাগের স্বররূপের উপযোগী এবং তার অন্তর্নিহিত রসরূপের বাহ্য প্রকাশের মূল স্বরূপ একটি

চাক্ষুষ প্রতীক বা দেবতা আছেন। এই দেবতাময় রূপ বা মূর্তিতে (তসবীরে) রাগের ভিতরকার রসরূপটি চাক্ষুষ চিত্রে মূর্তিমান্ হয়ে ওঠে। এই সকল রাগের দেবতারা সুরের সুরলোকে রসের অমরাবতীর নিভৃত স্থানে বাস করেন। গায়ক সংযত চিত্তে ধ্যানের দ্বারা আরাধনা করলে তবে রাগের দেবতারা সুরলোক থেকে মর্ত্যলোকে গায়কের কণ্ঠে বা যন্ত্রীর যন্ত্রে অবতীর্ণ হন। এই পৌরাণিকী কল্পনায় কোনও বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে কিনা তা অনুসন্ধান ও গবেষণার বস্তু।

সঙ্গীতশাস্ত্রীদের এই বিশ্বাস যদি নিছক কবি-কল্পনার ভিত্তিহীন বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করা যায়, তাহলেও শ্রাব্য বস্তুর চাক্ষুষ পরিকল্পনার একটি প্রয়োজনীয় 'প্রয়োগ' আছে। কোন রাগ বা রাগিণী কোন রসকে প্রকাশ করবার বিশিষ্ট শক্তি ধারণ করে, সঙ্গীতসাধকের পক্ষে তা অবশ্য জ্ঞাতব্য বস্তু। কারণ তা না জানলে শোক-প্রকাশক রাগিণীর স্বরূপ অবলম্বন কোরে গায়ক আনন্দদায়ী রসের অবতারণার বৃথা প্রচেষ্টা করবেন এবং সেই প্রচেষ্টাতে তাঁর সঙ্গীত-সাধনাও ব্যর্থ হবে। সুতরাং যে রাগ যে রসের উপযোগী সেই রাগ অবলম্বন কোরে সেই রসের ব্যাখ্যা ও পরিবেশন করতে হবে, নতুবা রসাভাস বা রসবিদ্বেষের সৃষ্টি হবে। শ্রোতার চিত্তে গায়ক যে রসটি জাগিয়ে তুলতে চান তা জাগানো তখন আর সম্ভব হবে না। এই জন্য এক একটি রাগের স্বর-মূর্তির সৃজনে বা গঠনে তার রসরূপের বিরোধী স্বরটি বর্জন কোরে, তার নাদময় রূপ গঠিত হয়।

শার্ঙ্গদেবের মতে 'স্বর-সপ্তক' বা 'স্বরগ্রামের' প্রত্যেকটি স্বর এক একটি বিভিন্ন রস প্রকাশ করবার বিশিষ্ট শক্তি বহন করে। করুণ রসের রাগিণী করুণ রস সহজে জাগাতে পারে এমন স্বর নিয়ে তার নাদময় রূপ গঠিত হয়। এক একটি স্বরের বিভিন্ন রস উৎপত্তি করবার শক্তি তাদের আছে কিনা হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পশুশালার পশুদের সঙ্গীতের স্বর শুনিয়ে তাদের 'ব্যবহার' ও 'সাড়ার' প্রকৃতি ও পরিমাণ লিপিবদ্ধ কোরে, স্বরগুলির রসশক্তির বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণ ও পরীক্ষা চলেছে। কিছু বৈজ্ঞানিকী পরীক্ষা না করেও রাগ-রূপ কর্ণ দ্বারা আস্বাদন করে বলা যায় যে, ভৈরবীর রসসত্তার মধ্যে একটি করুণ আত্মনিবেদন

কানাড়া রাগিণী

ভূপালী

ভৈরবী রাগিণী

ও আরাধনার আকৃতি সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়।

ললিত রাগিণীর স্বর-গঠনের আবেদনে একটি সদ্যোবিরহের বা বিচ্ছেদের বেদনা সহজে অনুভব করা সম্ভব হয়। সুতরাং ভৈরবী রাগিণীকে যদি শিবের আরাধনারতা পার্বতীর চিত্র অবলম্বন কোরে এর 'দেবতাময়' রূপ (বা তসবীর) গড়ে তুলি, তবে এই চিত্রটি ভৈরবী রাগিণীর সহজবোধ্য চাক্ষুষ ডায়াগ্রাম (প্রতীকচিত্র) বোলে গ্রহণ করতে বোধ হয় কারও আপত্তি হবে না। তেমনই রাত্রির শেষে সূর্যোদয়ের প্রাক্-কালে নায়ক-নায়িকার শয্যা ত্যাগ কোরে গত রজনীর সম্ভোগলীলার স্মৃতিরূপে পুষ্পমাল্য হস্তে ধারণ করে প্রেমলীলা সমাপ্ত করেন এবং শয্যাগৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দিবসের কর্মজীবনের পথে চলেন, এই চিত্রটি অবলম্বন কোরে যদি ললিত রাগিণীর রস-

কানাড়া রাগিণী

সঞ্চারের চাক্ষুষ পরিচয় দেওয়া যায়, তা হলে চিত্রটি যে চিত্রকরের বাতুল কল্পনামাত্র নয়—পরন্তু তা যে 'ললিত' রাগিণীর সঠিক দৃশ্যরূপ—একথা সহজেই অনেকে মেনে নেবেন। 'ললিতে'র দৃশ্যরূপ কিছু বিভিন্ন।

অনেকের মতে 'ললিত' এবং 'ললিতা' দুটি বিভিন্ন রাগিণী, সুতরাং তার দৃশ্যমূর্তির রসরূপও বিভিন্ন। এটি হল খণ্ডিতা নায়িকার রসরূপ। সমস্ত রাত নায়িকাকে একাকী রেখে 'শঠ নায়ক' বা 'কুটিল নায়ক' অন্য নায়িকার কাছে রাত্রি যাপন কোরে পর-রতি-চিহ্ন ধারণ কোরে—প্রত্যূষে উপেক্ষিতা নায়িকার কাছে ফিরে নানা মিথ্যা কাহিনীর দ্বারা দোষ ক্ষালনের চেষ্টা কোরে বিনীত সুরে এই নায়িকার ক্ষমা ভিক্ষা করছেন—এইটি হল 'ললিতা' রাগিণীর নাট্যরূপ। 'মানবতী' বা 'রাম-কিরী' রাগিণী অনেকটা 'ললিতা' রাগিণীর অনুরূপ; নায়িকার পদপ্রান্তে বসে রুষ্ট বা খণ্ডিত নায়িকার তুষ্টি সাধনার প্রচেষ্টার চিত্র। এইসব বিভিন্ন রাগিণীর বিভিন্ন রস—সংস্কৃতভাষা বা হিন্দী কবিতায় ধৃত ধ্যানে বেশ স্পষ্ট ভাষায় লেখা হয়েছে।

আমরা কয়েকটি রাগিণীর চিত্রের প্রতিলিপির সঙ্গে তাদের নির্দিষ্ট ধ্যান উদ্ধৃত কোরে দিলাম। ধ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে ছবিগুলি দেখলে—ঐ ঐ রাগিণীর অন্তর্নিহিত রসটি কি তা সহজেই বোঝা যাবে। এরূপ, এইসব রাগমালার চিত্রগুলি—তাদের রসরূপের নির্দিষ্ট ডায়গ্রাম হিসাবে আকবর বাদশাহের সময় থেকে সঙ্গীতসাধকরা ব্যবহার কোরে আসছেন। কেবল গত দুই শতাব্দীর মধ্যে সুরের ওস্তাদগণ এই রাগ-মালার চিত্রকে অবজ্ঞা কোরে রাগরাগিণীর রসরূপের রহস্য হারাতে বসেছেন।

ললিতা রাগিণী—

কুটিলো ললিতো ললিতো বিভাতায়াতা বিনীততাম নায়ন্।
নিহ্নুত পর-রতি চিহ্নো গদতি বধূম্ চাটু-পটুঃ খিন্নাম্ ॥

বসন্ত রাগ—

১। চূতাঙ্কুরৈরেণৈব কৃতাবতংসো বিঘূর্ণ-মানারুণ-চারু-দেহো বসন্ত-রাগো যুবতী-প্রিয়শ্চ।

২। নাচতি গাবতিসুখ মগন ফিরতি সঘন-বন-কুনুজ।
পতিহি দীপক মন বশী কিয়ো সো বসন্ত সুখ-পুঞ্জ ॥

বসন্ত রাগ

কানড়া রাগিণী—
অশোকবৃক্ষস্য তলে নিষণ্ণা, বিয়োগিনী বাষ্পকণা-
কুলাক্ষী।
বিভূষিতাঙ্গী জটিলৈক বেণী সা কানড়া হেমলতেব তন্বী।।

রামকিরী (রামকেলী) রাগিণী—
স্বর্ণপ্রভাভাস্বর ভূষণাঢ্যা, সদীন্দ্রনীলম্ বপুষা বহন্তী
কান্ত-পদ-প্রান্ত-মধিস্থিতেঽপি, মানোন্নতা রামকিরী
প্রদিষ্টা।।

হিন্দোল-রাগ—
নিতম্বিনী মন্দ তরঙ্গিতাসু দোলাসু খেলা সুখমাদধানঃ।
খর্ব্বঃ কপোত-দ্যুতি কামযুক্তো হিন্দোল-রাগঃ কথিতো
মুনীন্দ্রৈঃ।।

ভূপালিকা রাগিণী—
স্বনায়কে পুষ্প-গণম্ সৃজন্তী সুশোভমানা বরকামিনী চ
উন্নাসিতা প্রেম-মদা-কুলাক্ষী ভূপালিকা সা কথিতা
কবীন্দ্রৈঃ।।

ভৈরবী রাগিণী—
স্ফটিক-রচিত-পীঠে রম্য কৈলাস-শৃঙ্গে
বিকচ কমল পত্রৈরর্চয়ন্তী মহেশম্।
কর-ধৃত-ঘন-বাদ্যে পীত-বর্ণায়তাক্ষী
সুকবিভিরিয়মুক্তা ভৈরবী ভৈরব-স্ত্রী।।

পূজা সংখ্যার পর

নীলকণ্ঠ

তেমন পুস্তক-প্রিয় নন, কিন্তু সাংঘাতিক পত্রিকা-বিলাসী আমার এক বন্ধু গত বছরের শারদীয় সংখ্যাগুলি চেয়ে নিয়ে আমাকে বিব্রত করেছিলেন; ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম: গত বছরেরও আগের বছর অর্থাৎ ১৩৬১-র পূজা সংখ্যাগুলো—আমি লিখি-টিখি শুনে, পড়তে চেয়ে নিয়ে, ফেরত দিয়েছিলেন ধন্যবাদের সঙ্গে। গত বছরের অর্থাৎ ১৩৬২-র 'পূজা স্পেসাল'গুলো কিন্তু পাওয়া মাত্র ফেরত দিলেন, না পড়েই পত্রপাঠ ফিরিয়ে দিলেন; সঙ্গের এক চিরকুটে সংক্ষিপ্ত করলেন তাঁর বীতরাগের কারণ এই বলে যে, আমি বোধ হয় ভুল করে ১৩৬২-র বলে আবার ১৩৬১-র শারদীয় সংখ্যাগুলিই পাঠিয়েছি, যেগুলি তাঁর আগের বছরই পড়া হয়ে গেছে।

রসিকতাটা প্রথম মুখে অস্বীকার করব না, আমার মধ্যে যথেষ্ট উত্তাপের সৃষ্টি করেছিল; তারপর অবশ্য ১৩৬১-র এবং ১৩৬২-র পূজা সংখ্যাগুলো পাশাপাশি মেলে ধরতেই সবটুকু উত্তাপই মুহূর্তে উবে গেল; আমার বন্ধুটি যদি রসিকতাই করে থাকেন ত বলব এমন রসিকতা শ-য়ের পক্ষেও সহজ ছিল না। চিরকুটে আমার সেই বন্ধুর বীতরাগের কারণ নেহাতই স্বকপোলকল্পিত নয়, অনেকটাই সত্য।

শুধু গত বছরের সঙ্গে তার আগের বছরের নয়, গত কয়েক বছরের প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য শারদীয় সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ওই একটিমাত্র কারণেই; সে কারণ আর কিছুই নয় কেবল এই মাত্র যে বছর থেকে বছরে আমাদের পূজার বিশেষ সংখ্যাতে বিশেষ কোন পরিবর্তনই সূচিত হয় না; তার অঙ্গে সালের এক থেকে দুই, ১৩৬১ থেকে ১৩৬২, এ-ছাড়া আর কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ে না; অনুল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মহিমাতেই আমাদের বিশেষ বিশেষ কাগজের বিশেষ সংখ্যার যা কিছু উল্লেখযোগ্যতা; তার বাইরে আর কিছুতেই নয়। এর আকৃতি অনিবার্য ভাবেই এক, এর প্রকৃতিও তাই।

পূজা সংখ্যার প্রথম ও শেষ প্রচ্ছদে প্রত্যেক বছর যথাক্রমে সেই তেলের এবং বিস্কুটের বিজ্ঞাপনের একই পরিচ্ছদ। বছরের পর বছর একই স্কেচে, এক লে-আউটে এবং একই ধরনের ইলাস্ট্রেশানে এদের অন্তর্বাস পর্যন্ত এক। আবরণের ক্ষেত্রেই নয় অঙ্গের আভরণের ক্ষেত্রে পর্যন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এক রকম কাগজে, এক রকম ছাপা; একরকম বাঁধাই-এর কৃতিত্বে হাতে করবার সঙ্গে সঙ্গে আশ্বিনেই পূজা-সংখ্যার পৃষ্ঠাগুলো চৈত্রের ঝরা পাতার মতো মেঝেময় উড়তে থাকে।

পূজা সংখ্যা যে পড়বার মতো হয় না তাতে আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত নই; আমার আফশোষ কিংবা আপত্তি এইখানেই যে এগুলি দেখবার মতোও হয় না। প্রাণের উত্তাপ থেকে বঞ্চিত পূজা সংখ্যারা বৈচিত্র্যবিহীন পরিবেষণের পুনরাবৃত্তিতে নিয়ম রক্ষার প্রচেষ্টা মাত্র। সম্বৎসর বিস্মৃত পরলোকগত কোন ব্যক্তির বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিনটির মতোই এতে শ্রদ্ধার অভাব; এতে মুখরক্ষা হয় কিনা জানি না কিন্তু স্মৃতিরক্ষা হয় না জানি।

স্মরণাতীত কাল থেকে আশ্বিনের আকাশ প্রস্তুত হয়ে আসছে পূজো আসবে বলে; তেমনি করেই এসেছে শিউলী-ফোটা সকাল, আজও রাত পোহায় তেমনি করেই শারদ প্রাতে। শুধু পুজো হয় না তেমন করে; বাংলা দেশে পুজোর অবকাশে প্রসব হয় শুধু অগুন্তি মৃতবৎসা পূজার কাগজ। বাংলা দেশের কাগজের পূজা সংখ্যারা কেবল অপাঠ্য যে তাই নয়, সেগুলি দুঃসহ, সেগুলি দৃশ্যকটু।

হাতে নিলেই হেসে ওঠে এমন একখানা পূজা সংখ্যার কথা কল্পনা করি প্রত্যেকবার। আর প্রত্যেকবারই হাতে এসে ওঠে সূর্যের স্পর্শবঞ্চিত মৃতপত্র। বিবর্ণ, নিস্তেজ, নিঃস্ব। নামগোত্রপরিচয়পত্রহীন পত্রিকা থেকে বনেদী কুলীন পত্রিকা পর্যন্ত হেসে ওঠা দূরে থাক, এমন হাহাকার করে ওঠে হাতে নিলে যে দুঃখ হয়। সে দুঃখ আমার একার নয়; হয়ত অনেকের; হয়ত কেন

অনেকেরই নিশ্চয়ই। শুধু অনেকেরই বা কেন, সেই একজনেরও যিনি নিরুপায় বসে আছেন সম্পাদকের হাতল-ভাঙা কেদারায়; সেই ব্যক্তিরই বোধ হয় সব চেয়ে মর্মান্তিক মনের অবস্থা। আমাদের দেশের কাগজে সম্পাদকনামা ব্যক্তি আছেন অনেক; কিন্তু 'ব্যক্তিত্ব' নেই একটিরও। দুর্ভাগ্যবশত কোনও সম্পাদক-ব্যক্তির যদি ব্যক্তিত্ব থাকে তাহলে তাঁকে হয় চেয়ার ছাড়তে, নয় সমস্ত অবিমৃষ্যকারিতা হজম করতে হয়। হয় প্রস্থান নয় পশ্চাদপসরণ। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই বেছে নেবার। ব্যক্তির হয়তো আছে; কিন্তু 'ব্যক্তিত্বে'র নেই নিশ্চয়ই। এদেশে অন্তত তার নমুনা নেই একটিও। এ সেই বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সেলুকাসকে শেষ কথা বলা: 'সত্যই কী বিচিত্র এই দেশ' যে!

এই বসুমতী যে মানুষের বাসযোগ্য হতে পেরেছে সে শুধু মানুষের জন্যেই নয়, প্রকৃতির জন্যেও; প্রকৃতির সংহারমূর্তির সঙ্গে মানুষের যত বিরোধই হোক, প্রকৃতির সংহারমূর্তির কাছে মানুষ দু'হাত পেতে দাঁড়িয়েছে চিরকাল; পৃথিবী যার প্রিয় নাম আসলে সে মাটির ঢেলা মাত্র। প্রকৃতিই তাকে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করেছে রমণীয় করে; সাজিয়েছে তাকে স্বয়ংবরার বেশে। এই সাজাতে জানানোর জন্ম শিল্পের তাগিদেই। সাজাতে জানাটাই বিশেষ শিল্পবোধ। আর সাজাতে না জানলে, সাজাতে গিয়ে একটু এদিক-ওদিক হলেই তা সাজা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন শুধু সাজানোর অভাবে প্রত্যেকবার সাজা হয়ে দাঁড়ায় পূজার পত্রিকাগুলো।

প্রত্যেক পূজা সংখ্যার প্রারম্ভে থাকে দুর্গার আঁকা ছবি; আঁকা-ছবি না বলে তাকে আলোছায়া ছবি বলাই সঙ্গত; কারণ আঁকা হলে কোনও মূর্তির সঙ্গে কোনও মূর্তির এমন হুবহু সাদৃশ্য অসম্ভব হতো। কল্পনার ধ্যাননেত্রে শিল্পী প্রত্যক্ষ করে দুর্গাকে একেকবার একেক-রকম; তাই তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীতে আমাদের কল্পনার বিপুল বিস্তার; দুর্গা যদি বাস্তব হতো এবং তার ছবি না এঁকে যদি ছবি তুলতো কেউ তাতেও বোধ হয় এতটা একঘেঁয়ে হতো না, বৈচিত্র্যহীনতায় পূজা সংখ্যার দুর্গা মূর্তিগুলি একে অপরের অনুকরণে গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসানোর ফলে যতটা গতানুগতিক হয়!

দুর্গার ছবি দিয়ে পূজা সংখ্যার আরম্ভ মাত্র! শেষ নয়; দুর্গার সঙ্গে অবধারিতভাবেই আছে এক অথবা একাধিক দুষ্প্রাপ্য চিত্র। সেগুলি কোন্ কারণে চিত্র এবং কিসের জন্যে দুষ্প্রাপ্য অনেক সময়ই তা বোঝা দুষ্কর। যা পাওয়া যায় না তা-ই দুষ্প্রাপ্য হতে পারে কিন্তু তা-ই চিত্র হতে যাবে কোন্ দুঃখে? কোনও এক অসময়ে দুষ্প্রাপ্য, হয়ত সত্যি সত্যি একাধারে দুষ্প্রাপ্য এবং চিত্র, দু-ই—কেউ একখানা ছাপেন কোন পূজা সংখ্যায়। তারপর থেকেই তা শুধু চালু নয়, বংশপরম্পরায় বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করেছে। আমার বক্তব্য অথবা অভিযোগ যাই বলুন এ-ব্যাপারে এই মাত্র, যে দুষ্প্রাপ্য চিত্র ছাপতেই হবে এমন কোনও দায় নেই কোনও কাগজেরই। যা দুষ্প্রাপ্য তাতে আমাদের এতটুকু লোভ নেই; যা প্রাপ্য তাতেই আমাদের যা কিছু আকর্ষণ; সেইটুকু মাত্র পেলেই যে আমরা সত্যি সত্যিই সন্তুষ্ট!

দুষ্প্রাপ্য চিত্রের সঙ্গে ছাপা হয় আরেক ধরনের ছবি। যাকে বলতে পারি উচ্ছিষ্ট চিত্র; অর্থাৎ যা পোস্টকার্ডের গায়ে হেলায় ফেলায় অত্যন্ত সহজে আঁকি বুঁকি করেছেন কোন অতিখ্যাত চিত্রকর;—তাঁর আঁকা অরিজিনল ছবি যোগাড় করতে না পেরে, নামের লোভে তাঁর আঁকা এই সব এবরিজিনল প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত পূজা সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায়, প্রধান ও প্রথম।

গল্পগুলি চিত্রিত করে প্রকাশ করা হয় পূজা সংখ্যায়, বিচিত্রিত করে! ছবিগুলোর দিকে এক নজর তাকালেই বলে দেওয়া যায় ছবিগুলি বোবা; একেবারেই কথা বলে না; মূক এবং মৃত। চলচ্চিত্র নির্বাক হতে পারে কিন্তু গল্পের অলংকার হিসেবে যে চিত্র তাকে সবাক হতেই হবে।

যেটুকু লেখায় বলা হয়নি, সেটুকু রেখায় বলে দিতে হবে বৈকি; না হলে গল্পের সঙ্গে ছবি দেওয়া ত ছেলে-মানুষী; সে ত সোনায় তাহলে সোহাগা নয়; সেত সত্যিকারের সিলভারের অঙ্গে জার্মান সিলভারের বিজ্ঞপ্তি! শুধু গল্পের ছবিতে নয়, গল্পের এবং গল্পকারের নামের আক্ষরিক চিত্রে যে রূপান্তর ঘটানো হয় তা প্রায়ই নতুন-ত্বের স্পর্শবঞ্চিত একই রীতির পৌনঃপুনিকতায় বিবর্ণ, বিস্বাদ। কখনও কখনও নতুনত্বের মোহে তার অঙ্গে দুর্বোধ্যতার আলিঙ্গন। শিষের হরফে ছাপলে যা সহজ-বোধ্য হতো আক্ষরিক চিত্রের আবদার তা পাঠকের চোখে এমন চমকায় যে সেই গোলকধাঁধায় নামটি উদ্ধার করা কষ্ট হয়ে দাঁড়ায়; গল্পের ইলাস্ট্রেশন হিসাবে যে চিত্রের অবধারিত অবস্থিতি, গল্পকে স্পষ্ট করবার কারণেই তার সার্থকতা; পাঠককে কষ্ট দেবার জন্যে নয় মোটেই।

এই সহজ কথাটাই বারবার বলতে হয় আমাকে তার কারণ সহজ কথা সহজে বলা যায় না; বলা গেলেও সকলকে বোঝানো যায় না কিছুতেই!

পূজা সংখ্যায় রেখার চেয়ে বেশি থাকে লেখা; তার চেয়ে বেশি বিজ্ঞাপন। সবচেয়ে দুঃসহ, সবচেয়ে দুর্বহ এই বিজ্ঞাপনগুলি। এগুলি প্রায়ই কিছু জ্ঞাপন করে না; অথবা যা কিছু বক্তব্য সবই গুলিয়ে দেয়। বিজ্ঞাপন হচ্ছে যে কোনও পত্রিকার অঙ্গে মনোহারী দোকানের মতো; কিন্তু সেই বিজ্ঞাপন মনোহরণ করা দূরে থাক· যখন পারার মত পত্রিকার গায়ে ফুটে বেরোয় তখন পত্রিকা-সম্পাদকের কী হয় বলতে পারি না; পত্রিকা-পাঠকদের লজ্জা করে! শুধু মাত্র বিজ্ঞাপনের সুচারু বিন্যাসেই একখানা কাগজের চেহারা খুলে যেতে পারে; বিজ্ঞাপন নিজেই সেখানে কাগজের একটা ফিচার; বিলেতি কাগজে তার নমুনা অজস্র; তার উল্লেখ করাটাই বাহুল্য; আমাদের এখানে অন্যপক্ষে বিন্যাসের অভাবে বিজ্ঞাপনই কাগজ সুখদৃশ্য হবার পক্ষে সব চেয়ে বড় বাধা। পাঠকের চরম ডিসকম্‌ফিচার।

রেখার প্রসঙ্গ ছেড়ে পূজা সংখ্যার লেখার প্রসঙ্গে এলেও হতাশ হতেই হয়। লেখাই পূজা সংখ্যাদের প্রাণমূর্তি; রেখা সেই মূর্তির গায়ে বিচিত্রাঙ্কন। কিন্তু যার প্রাণই নেই তার গায়ে আপ্রাণ আভরণের পর আভ-রণের বোঝা চাপালে তা দর্জির ডামী হয়; তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় না। রমণীর দামেই রমণীয় ভাবে সাজার দাম; ডামীর গায়ে জড়ানো কাপড়ের ওপর কাপড়ের দামই শুধু বিঘোষিত; কাপড়ের মূল্য যতই হোক ডামীর কোনও মূল্য নেই; সে নেহাতই অর্থহীন।

যে-কোন পূজা সংখ্যা, নামী অথবা অনামী, না খুলেও, একটি পৃষ্ঠা না পড়েও আপনি স্বচ্ছন্দে বলে দিতে পারেন তার সূচীপত্র; সেখানে রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত একটি কবিতা, একাধিক পত্রের গুচ্ছ, উপন্যাসের নামে বড় গল্প, অসংখ্য ছোট গল্প এবং কখনও একসঙ্গে কখনও ছত্রভঙ্গ কবিতাবলী এবং একটিও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের অনুপস্থিতি।

এই পূজা সংখ্যার প্রারম্ভে ছাপা হয় দুর্গাপূজার তাৎপর্য। এই লেখাটি কেউ পড়ে বলে মনে করবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই; এমন কি যিনি লেখাটি ছাপেন তিনিও না; পড়লে বছরের পর বছর একই রচনার পুনরাবৃত্তিতে তিনি নিশ্চয়ই আপত্তি করতেন। দুর্গাপূজার সংখ্যায় দুর্গাপূজা সম্বন্ধে একটু কিছু না দিলে কেমন দেখায় এই কারণেই ও-লেখা ছাপা; ও-ছাড়া ও-লেখার আর কোনও তাৎপর্য স্বীকার করা শক্ত।

সমসাময়িক জীবনকে ব্যক্ত করবার জন্যেই সব দেশে সব কালেই সাময়িক পত্রিকার জন্ম; তার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যেই সব কটি পত্রিকাই ব্যর্থ। এই সব পত্রিকার পূজার বিশেষ সংখ্যায় এই ব্যর্থতা আরও পীড়িতরকম প্রকট। যে-কাগজ কখনও বিক্রী হয় না সে-কাগজও শুধু পূজোর সময়ে প্রকাশিত হলেই বিক্রী হবে অথবা বিক্রী না হলেও কিছু বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবেই এই অভ্রান্ত ধারণাতেই অব্যর্থ শরসন্ধান। তারই ফলে সাময়িক আর দৈনিক পত্রিকার পূজা সংখ্যা আসলে খ্যাত অল্পখ্যাত ও অখ্যাতদের এলোমেলো রচনার সংকলন মাত্র।

অনেক সময়ই আমি অবাক হয়ে ভেবেছি এই সব পূজা সংখ্যার পৃষ্ঠে সম্পাদকের নাম এক আইন বাঁচানো ছাড়া আর কোনও প্রয়োজনে আসে কী না? না; আসে না। যে কোনও ছাপাওলা এবং দপ্তরী কতকগুলি লেখা ছবি এবং কিছু বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে পারলেই বার করতে পারে এমন সংকলন। অত্যন্ত অল্পে অথবা অনায়াসেই পারে। সম্পাদকের অস্তিত্ব সর্বপ্রধানতই নির্বাচন-নির্ভর। রচনা নির্বাচনের জন্যেই প্রয়োজন সম্পাদকের। পত্রিকার চরিত্রও এই রচনা নির্বাচনের উপরই নির্ভর করে। বাংলাদেশের সাময়িক পত্রিকার পূজা সংখ্যা প্রকাশের সংগ্রামে প্রথম যে নিহত হয় সে-ই ব্যক্তিরই নাম, নির্বাচন। নির্বাচনের সুযোগ, সময়, সৎসাহস, সবেরই অভাব, কাজ করে এই এলোমেলো সংকলনের পেছনে; যার নাম আছে সেই সব কাগজ যারা নেবে তাদের তালিকা দাম-আদায়-সহ আগেই প্রস্তুত; কাজেই কোনও রকমে তাড়াহুড়ো করে লেখা-গুলো একসঙ্গে বাণ্ডিল করে বাজারে বার করার অপেক্ষা মাত্র। যেসব কাগজ বনেদী নয় অথচ যাদের বিক্রী আছে তারা আবার বনেদী কাগজগুলি বাজারে আসবার অনেক আগেই নিজেরা বেরিয়ে পড়ে; এক লেখা, এক ছবি মায় এক বিজ্ঞাপনে বিকৃত এই ছোট-বড় কাগজগুলি কে কাকে ঠেলে কত আগে বেরুতে পারে তারই উপর বাজার মাৎ করার সবটুকু সম্ভাবনা নির্ভর করতে বাধ্য হয়; এবং তার ফলে রচনা ছবি অথবা রুচির নিরিখ এখানে উপলক্ষ্য মাত্র; লক্ষ্য হচ্ছে তারিখ।

এই নির্বাচন প্রসঙ্গে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে বড় গল্পকে উপন্যাস বলে বিজ্ঞাপিত করায়। সাধারণ পাঠক এ নিয়ে মাথা ঘামায় না, তাই এর প্রতিবাদ এখনও স্পষ্ট নয়; কিন্তু যাঁরা এই উপন্যাসের লেখক তাঁরাও যে আপত্তি করেন না এইটেই আশ্চর্যের। গল্প---গল্পই; পৃষ্ঠার সংখ্যা বৃদ্ধিতে তার হার বৃদ্ধি হয় না; উপন্যাসের রচনাশৈলী আর গল্পের আঙ্গিক কখনই এক নয়; গল্পকে উপন্যাস বলে চালালে পাঠক ঠকানো যায় হয়ত কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনার হাত থেকে সেই সঙ্গে বাঁচা যায় কি?

সাময়িক পত্রিকা ব্যক্ত করে সমসাময়িক জীবন কিন্তু আবিষ্কার করে আগামী কালের লেখককে। কিন্তু এসব কাগজে বিগত কালের লেখকরা ত বটেই; কোনও এক কালে যাঁরা লিখতেন এখন আর লেখেন না, তাঁরাও কেউ কেউ, এমন কি যাঁদের আর লেখবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত সেই পরলোকগতদেরও দেখা যায় অপ্রকাশিত রচনার নীচে তাঁদের স্বাক্ষরে। শুধু সর্বাগ্রে যাদের থাকবার কথা তারাই এখানে হাজির হয় না। আগামী কালের লেখকদের অনুপস্থিতিই লক্ষ্য করবার মতো; আগামী কালের লেখা এ-কালের কাগজে কেবলই অমনোনীত হয়।

আসলে যে সব খ্যাতিমানদের নামের তালিকামাত্রে পর্যবসিত হয় শেষ পর্যন্ত এই পূজা সংখ্যারা, সেই সব লেখকরা এই সব পূজা সংখ্যায় যা লেখেন সেগুলি লেখেন কোনও প্রেরণায় নয়; লেখেন প্রাণের দায়ে। সাংঘাতিক বেগে লেখেন অনেক; কিন্তু হৃদয়ের আবেগে লেখেন না একটিও। ফলে পঞ্জিকার মতো স্থূল হয় পূজা সংখ্যা, কিন্তু পত্রিকা হয় না একবারও। কাগজওয়ালারা পূজার জন্যে প্রস্তুত হবার অনেক আগে থেকেই লেখকরা পাত পেতে বসে আছেন। পাত পেতে না বলে তাকে ওৎ পেতে বলাই সমীচীন। 'কী লিখছেন', একথা কেউ পূজা সংখ্যা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে না; 'ক'টা লিখেছেন', এই হয় একমাত্র জিজ্ঞাস্য এবং তার জবাব হয় 'অসংখ্য'। শ্রদ্ধার সঙ্গে যে লেখা লেখা নয় তা আত্মপ্রতারণার নামান্তর; পাঠকও প্রতারিত হয় না; তার কারণ সে প্রত্যাশাই রাখে না। পূজা সংখ্যা তাদের কাছে সময় কাটানোর খেলনা মাত্র; ট্রেনে যেতে যেতেই তার দম ফুরিয়ে যায়। বাড়ি গিয়ে পৌঁছয় খুব কম। বাড়ি গিয়ে যেগুলি পৌঁছয় সেগুলি গৃহস্থের কাজে লাগে। ভাগ্যিস, বাজে কাগজ থেকেও আবার কাগজ তৈরী হয়, তাই রক্ষে! নাহলে বাংলা দেশের পূজা সংখ্যায় যত কাগজ লাগে তার জন্যেই পৃথিবী জুড়ে কাগজের দুর্ভিক্ষ দেখা দিত; কিন্তু কাগজের দুর্ভিক্ষ নয়, দুর্ভিক্ষ থেকে যাবে ভালো লেখারই চিরকাল।

গত বছর পূজা সংখ্যাগুলো বেরিয়ে যাবার পর কোনও একটি দৈনিকের জনপ্রিয় 'এককলমের' এই মন্তব্যটি মনে রাখবার মতো; 'এককলমী' লিখেছিলেন, শোনা যাচ্ছে এখনও অনেকে দরজা বন্ধ করে ঘাড় গুঁজে লিখে চলেছেন এক মনে; তাঁদের কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না যে পূজা হয়ে গেছে; পূজা সংখ্যায় লেখবার প্রয়োজন নেই আর। তবুও এই সব অজস্র, অসংখ্য পূজা সংখ্যায় অবিমিশ্র অবিমৃষ্যকারিতার মধ্যেও কখনও হঠাৎ যে 'তেলানাপোতা আবিষ্কার' চোখে পড়ে, অসংখ্য অর্বাচীন অমনোযোগিতার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে 'রস'---তার জন্যে কপালের কাছেই কৃতজ্ঞ হতে হয়। সেগুলি আসলে ফ্রিক; তফাতের মধ্যে শুধু এই যে এগুলি প্রকৃতির বদখেয়াল নয়, এই যা; তাই সেগুলি ফ্রিক নয়, ফ্লুক। লেখকের পক্ষে নয়, পূজা সংখ্যার পক্ষে।

রেখার প্রসঙ্গ দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম; রেখার প্রসঙ্গেই প্রত্যাবর্তন করি। বিজ্ঞাপনের কথা বলেছিলাম; এই সব পূজা সংখ্যায় যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তার কথাই বলিনি শুধু; বলতে চেয়েছিলাম এই সব পূজা সংখ্যায় যেসব বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সেগুলি সম্পর্কেও---সেগুলি ঘোষণাপত্র পূজা সংখ্যার। তার ভাষা, সাজানো, বক্তব্য পর্যন্ত প্রতি বছর একরকম এক। শুধু এরই মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে পূজা সংখ্যার প্রাণের কথা; অবগত হওয়া যায় তার মর্ম; পাঠোদ্ধার করা যাবে সংখ্যা-লিপির। প্রত্যেকটি পূজা সংখ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় মহালয়ায় বেরুবার। আমি অনেক দিন ভেবেছি এই অপকার্যের জন্যে মহালয়ার দিনটিই বিশেষভাবে বেছে নেবার কী কারণ। মহালয়াতেই যে আমরা তর্পণ তথা পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করি!

নক্সাশিল্পী শ্রীমতী উমা দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি

আজকের দিনে আমাদের দেশে নানা রকমের ইণ্ডাষ্ট্রী গড়ে তুলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে বিপুল সংখ্যক যন্ত্রবিদ, শিল্পবিদ, ইঞ্জিনিয়ার যে দরকার একথা সবাই জানেন। সেই সাথে সাথে বিভিন্ন শিল্পের জন্য একই পরিমাণে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিজাইনারেরও প্রয়োজন। আমাদের জীবনের নিত্যব্যবহার্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সব রকমের জিনিষ উৎপাদন করার কাজেই ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিজাইনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। যে কোন শিল্পদ্রব্য উৎপাদিত হওয়ার আগে তার প্রথম নক্সা ছকেন ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিজাইনার।

তাই জাতীয় শিল্পোন্নয়নের কাজে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিজাইনারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা একজন ডিজাইনারের পরিচয় দান করতে চাই যিনি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিজাইনিং-এর জগতে নবাগতা। এঁর নাম শ্রীমতী উমা দাস (আই,সি,এস, ডঃ নবগোপাল দাসের স্ত্রী)। ইনি সম্প্রতি ইংল্যাণ্ড থেকে টেক্সটাইল ডিজাইনিং শিখে এসেছেন।

শ্রীমতী দাসের ছাত্রী-জীবন সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক। ১৯৩৯ সালে কলকাতা গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্টে যখন প্রথম মহিলা ছাত্রী ভর্তি করা শুরু

হয়, ইনি সেই সময় আর্ট স্কুলে ভর্তি হন এবং সম্ভবত ইনিই কলকাতা আর্ট স্কুলের প্রথম ছাত্রী। স্কুলে এঁর পাঠ্য বিষয় ছিল লিথোগ্রাফ। শ্রীমতী দাস আর্ট স্কুলে প্রবেশ করার আগেই বিবাহিতা হন। ১৯৪০ সালে তাঁর স্বামী শ্রীযুক্ত দাস দিল্লীতে বদলি হওয়াতে তাঁকেও দিল্লী চলে যেতে হয়। দিল্লীতে থাকার সময় তিনি ওয়াটার কলারে ছবি আঁকা শুরু করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে দেখিয়ে দেওয়ার মত কেউই ছিল না। ১৯৪৫ সালে একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের প্রদর্শনীতে ইনি ওয়াটার কলার বিভাগে প্রথম পুরস্কার পান। ম্যাট্রিক পাশ করবার দীর্ঘ বার বছর পর ইনি আবার পড়াশুনা শুরু করেন এবং সিটি কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে বি,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫২ সালের আগে পর্যন্ত তাঁকে স্বামীর কার্যোপলক্ষে দিল্লী এবং কলকাতা দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াতে হয়। দিল্লীতে থাকার সময় শ্রীমতী দাস বেশ কিছুদিন অয়েল কলার ছবি নিয়ে মেতে ওঠেন। অয়েল কলারে ছবি আঁকার ব্যাপারেও তিনি কারো কোন উল্লেখযোগ্য সাহায্য পাননি। নিজে নিজেই নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং প্রচুর ছবি এঁকেছেন।

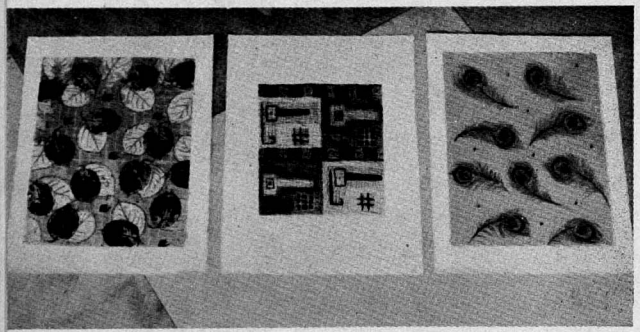

শ্রীমতী উমা দাসের কয়েকটি বয়ন-শিল্পের নক্সা।

১৯৫২ সালে কলকাতায় এসে তাঁর স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি হয়।

ডাক্তার তাঁকে ইউরোপে যাবার পরামর্শ দেন। অসুখ সারার চেয়ে ইউরোপ গিয়ে কোন একটা শিল্প-কাজ শিখতে পারার সুযোগটাই তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় এবং তিনি ঐ বছর ইউরোপ চলে যান।

ইংল্যাণ্ডের সেণ্ট্রাল কলেজ অফ আর্ট-এ টেক্সটাইল ডিজাইনিং তাঁর শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। টেক্সটাইল ডিজাইনিং বিভাগ আবার দুটি শাখায় বিভক্ত। একটি হল বয়ন (উইভিং), অপরটি মুদ্রণ (প্রিন্টিং)। শ্রীমতী দাস প্রিন্টিং বিভাগের ছাত্রী ছিলেন।

শ্রীমতী দাস সম্প্রতি কলকাতায় ফিরেছেন। কলকাতায় কাপড়ের উপর ফটোগ্রাফিক সিল্ক স্ক্রিনিং পদ্ধতিতে মুদ্রণের কাজ একমাত্র তিনিই জানেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তিনি আমাদের দেশের টেক্সটাইল প্রিন্টিং সম্বন্ধে অনেক দরকারী কথা আলোচনা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে মনে হল তিনি অনেক কিছু শিখে এসেছেন, এখন কাজ শুরু করে দেবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। তিনি বল্লেন, একটা ছোটখাট কাপড়ের ছাপাখানা খোলবার জন্য সুযোগ তিনি খুঁজছেন। নিজের হাতে ছাপা অনেক টেক্সটাইল আমাদের দেখালেন।

এছাড়া শ্রীমতী দাস 'ইউরোপের টেক্সটাইল ডিজাইনিং-এ ভারতের প্রভাব' বিষয়ে থিসিস লিখে বিদেশী পরীক্ষকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন।

আমাদের দেশে দক্ষ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিজাইনারের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। তাঁদের মধ্যে আবার মহিলা শিল্পী বলতে গেলে প্রায় নেই। সেদিক থেকে শ্রীমতী দাসের এই শিক্ষার একটা বিশেষ মূল্য আছে।

॥ ভাদ্র ও আশ্বিন

খবরাখবর

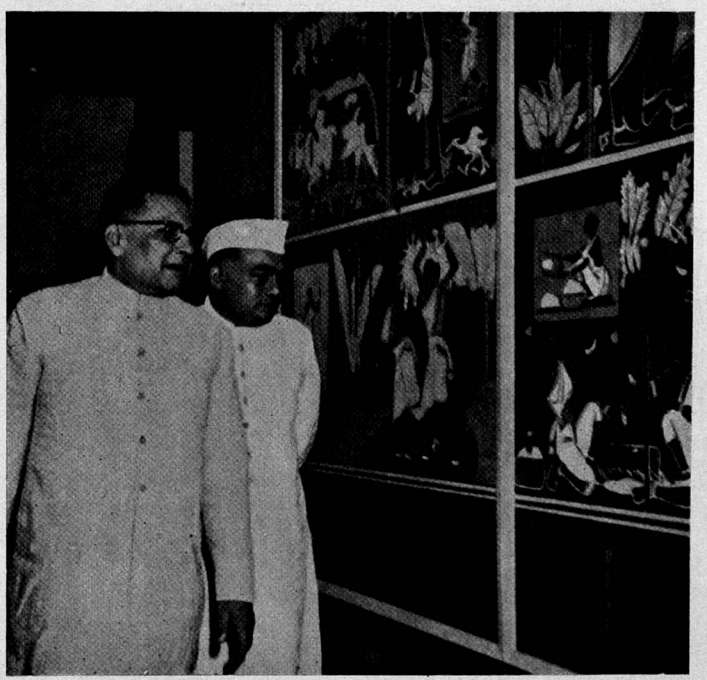

বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতব টী-বোর্ডের সদ্যোদ্‌ঘাটিত টী-রুমের সমর ঘোষ অঙ্কিত প্রাচীর চিত্র দেখছেন।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কুটিরশিল্প সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অবগত হবার জন্যে জাপান গিয়েছেন। প্রকাশ, তিনি যে সব তথ্য অবগত হয়েছেন, তা আমাদের উদ্বাস্তুদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের কাজে বহুলভাবে লাগবে। এতে বেকার সমস্যা সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক সমাধান সম্ভব হবে। ডাঃ রায় এলে আমরা তাঁর কাছ থেকে হস্তশিল্প এবং কুটিরশিল্প সম্পর্কে বিস্তৃত ও বিশদ খবরাখবর জানবার চেষ্টা করবো।

ফিল্ম সোসাইটি প্রদর্শিত বিখ্যাত পোলিশ চিত্র 'মেন অব দি বু ক্রশ'-এর একটি দৃশ্য।

সম্প্রতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আরোগ্য-নিকেতন' উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দিয়েছেন। 'বিশ্বরূপা'য় অভিনীত এই নাটকের সাফল্য সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের অবহেলিত দিকটি যেমন পূর্ণ হবার প্রতিশ্রুতি দিল, তেমনি বর্তমানকালের শক্তিশালী সাহিত্যিকদের নতুন নাটক রচনা করবার প্রেরণাও দিয়েছে। আশা করি, পেশাদারী এবং অপেশাদারী নাট্যসম্প্রদায় এখন থেকে আধুনিক সাহিত্যিকদের নাটক মঞ্চস্থ করবার চেষ্টা করবেন। এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যিকগণও নতুন উৎসাহে ভালো নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হবেন, বাংলা সাহিত্যে ভালো নাটকের অভাব ঘোচাবার সৎ প্রচেষ্টায় ব্রতী হবেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, 'আরোগ্য-নিকেতন' বইটি সম্প্রতি ভারতীয় সাহিত্য একাদেমি কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। ইতিপূর্বে এই উপন্যাসটি 'রবীন্দ্র পুরস্কার'-ও অর্জন করেছিল।

ভারতের পক্ষ থেকে বিশ্রুতকীর্তি চৈনিক সাহিত্যিক লু স্থনের স্মরণোৎসবে যোগদানের জন্যে তারাশঙ্কর শীঘ্রগীরই চীন যাচ্ছেন। তাঁর যাত্রাপথ শুভ হোক, সুন্দর হোক, কামনা করি।

চীন ও ভারতের মৈত্রীর সাম্প্রতিকতম নিদর্শন একাডেমি অফ ফাইন আর্টিসের সালৌ-তে বৌদ্ধ শিল্পের এক প্রদর্শনীর উদ্‌ঘাটন। শিল্প-সংস্কৃতির মাধ্যমে স্থাপিত মৈত্রীবন্ধন দীর্ঘস্থায়ী হয়, তার প্রমাণ বিশ্ব-ইতিহাসে মেলে। নবোদ্‌ঘাটিত এই শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজনের পেছনে আছে শ্রীযুক্ত শৈল মুখোপাধ্যায় ও লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম। এঁদের শিল্পোৎসাহ এবং শিল্প-প্রসার প্রচেষ্টার কথা সর্বজন-বিদিত। এধরনের শিল্প-প্রদর্শনী করার জন্যে আমরা তাঁদের সাধুবাদ জানাচ্ছি।

সম্প্রতি চিত্তরঞ্জন এ্যাভিন্যুতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে কৃষ্ণনগরের পুতুলের এক প্রদর্শনী হয়েছিল। সরকারের প্রযোজিত এই সুরুচিপূর্ণ প্রদর্শনী দেখে আমর, বিশেষ আনন্দলাভ করেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা 'ছায়ানট' নামে। একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা স্থাপন করেছেন। এঁরা সংগীত। নৃত্য ও নাট্যের সংযোগে কয়েকটি অনুষ্ঠান করেছেন। বিগত ২রা অক্টোবর এঁরা 'বিশ্বরূপা'তে কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথের 'শেষ-বর্ষণ' মঞ্চস্থ করেছেন। আমরা 'ছায়ানট'-এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

মিডলটন্ ষ্ট্রীট এবং চৌরঙ্গী রোডের সংযোগস্থলে 'সদারঙ্গ'-এর প্রযোজনায় এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। ভারতবর্ষের বিখ্যাত শিল্পীরা এতে অংশ গ্রহণ করছেন। এ-জাতীয় সংগীত-সম্মেলনের আয়োজন করার জন্যে গীতরসিকদের তরফ থেকে আমরা 'সদারঙ্গ'-এর কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

আমরা একথা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে 'টী-বোর্ড' বোম্বাইতে 'রেশমভবন'-এ শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত যে 'টী-সেন্টার'-এর উদ্‌ঘাটন করেছেন, তার প্রাচীরচিত্র এবং অলংকরণকার্য করেছেন আমাদের বাঙালী শিল্পী শ্রী সমর ঘোষ। পান-ভোজনের মতো জৈবিক ব্যাপারও যে শিল্প-সুষমার সুতৃপ্ত সাহচর্যে সম্ভব হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে টী-বোর্ড, রুচিশীল ব্যক্তিমাত্রেরই প্রশংসা-ভাজন হয়েছেন। এই 'টী সেন্টারে' কি ক'রে চা তৈরি করতে হয় সে সম্পর্কে গৃহিণীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও এঁরা করেছেন। শোনা যাচ্ছে, কলকাতাতেও এ-রকম একটি 'টী সেন্টার' খোলার চেষ্টা চলছে। যদি তা হয় তবে এখানকার এই সেন্টারও যাতে বাঙালী আবহাওয়ায়, বাঙালী ধরনে, বাঙালী শিল্পীদের দ্বারা অলংকৃত ও সুশোভিত হয়, তার ব্যবস্থা হলে সুখী হবো।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কারুশিল্পীদের এক মেলা শুরু হয়েছে। শিল্প-অধিকর্তা এই মেলার ব্যাপারে যথেষ্ট আয়োজন করেছেন। বাংলাদেশে এ-জাতীয় মেলার জন্যে

পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা শ্রীমাখুর শ্রীনেহরুর কাছ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে পুরস্কৃত 'পথের পাঁচালী'-র জন্যে রাষ্ট্রপতি পদক গ্রহণ করছেন।

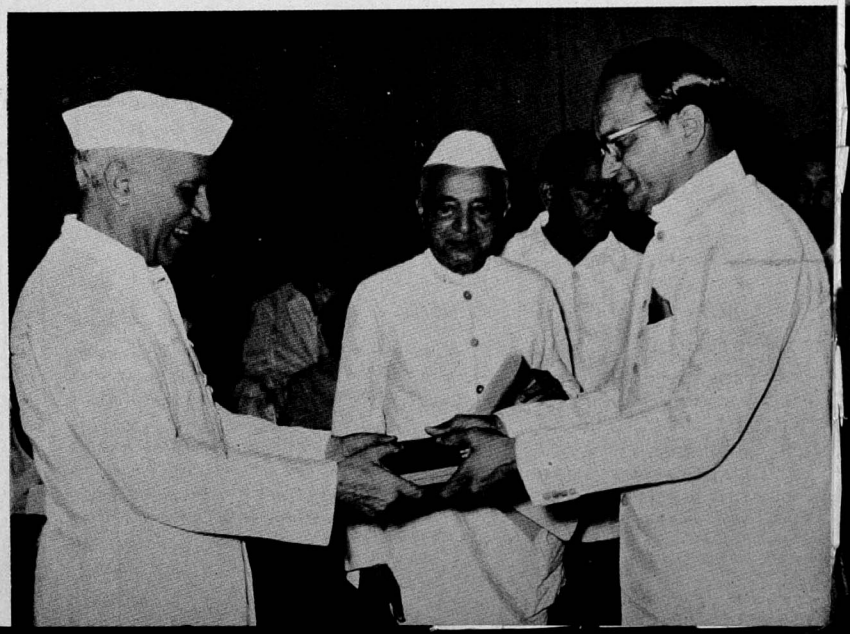

শিল্পী রাজেন তরফদার পরিচালিত 'অন্তরীক্ষ' চিত্রের একটি দৃশ্য।

তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শিল্প-অধিকর্তার প্রচেষ্টায় এতদিন পরে বাঙালী শিল্পানুরাগীদের এ-জাতীয় মেলা দেখা সম্ভব হলো। নিঃসন্দেহেই এ অত্যন্ত আশা এবং আনন্দের সংবাদ।

সাম্প্রতিক ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'র চিত্রসাফল্য এক অসাধারণ ঘটনা। 'পথের পাঁচালী'র এই সাফল্য যা প্রমাণ করেছে তা হল : 'পথের পাঁচালী'র মতো গ্রন্থের চিত্ররূপ দেবার সাহস একমাত্র বাঙালী শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব ; দ্বিতীয়ত, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মতো অনন্যব্যক্তিত্বের পক্ষেই এ-জাতীয় চিত্র প্রযোজনায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব ; তৃতীয়ত, দর্শকের জন্যে চলচ্চিত্রে যে সমস্ত আবেদনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে-ধারণা এতদিন চলতি ছিল, 'পথের পাঁচালী' চিত্রের শুভ্র সৌন্দর্য তার মূলে কুঠারাঘাত করেছে ; সেই সঙ্গে এও প্রমাণিত হয়েছে যে বাঙালী দর্শকই একমাত্র ভালো ছবির যথার্থ সমাদর করতে পারে এবং করতে জানে।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার অধিকর্তা শ্রীযুক্ত মাথুরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কারণ বাংলা-দেশের তরফ থেকে সারা ভারতের সম্মান তিনি আজ বহন ক'রে আনলেন। 'পথের পাঁচালী' সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রৌপ্যপদক তো পেয়েইছে, তা ছাড়া সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পাবার সৌভাগ্যও সে অর্জন করেছে। আমরা সমবেতভাবে সত্যজিৎ রায়কে এজন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং তাঁর আগামী চিত্র 'অপরাজিত'র সাগ্রহ প্রতীক্ষায় আছি।

দেশবিদেশের সার্থক সুন্দর ছবি দেখিয়ে চিত্রামোদী জনসাধারণের রুচির মানোন্নয়ন ও সেই সঙ্গে বিদেশের ফিল্ম সোসাইটির কার্যকলাপ, সিনেমাশিল্পের সঙ্গে তার যোগাযোগ ও বিশেষ ক'রে ফিল্মকে শিল্পের পর্যায়ে তুলে ধরার ব্রত নিয়ে কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির পুনরাবির্ভাব। সোসাইটি নিজস্ব একটি লাইব্রেরী করেছে ; প্রতি সপ্তাহে সেখানে একটি করে আলোচনা-সভা হবে ঠিক হয়েছে। এ-ছাড়া অক্টোবর মাস থেকে নিয়মিতভাবে সোসাইটির মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ম' কোয়ার্টারলি প্রকাশিত হচ্ছে। সভ্যরা বিনা মূল্যে এবং ছাত্র ও জুনিয়ার ফিল্ম টেকনিসিয়ানরা সুবিধাজনক হারে এই পত্রিকা পাবেন।

শিল্পীরা যদি চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজে হাত দেন তাহলে সেই শিল্পটি কতখানি সম্ভাবনাময় হয়ে উঠতে পারে সেকথা শিল্পী-পরিচালক সত্যজিৎ রায় প্রমাণ করে দিয়েছেন। সম্প্রতি আর একজন শিল্পী শ্রীরাজেন তরফদার এই কাজে হাত দিয়েছেন। তিনি সিনে আর্ট প্রোডাক্সন্সের হয়ে তুলসী লাহিড়ীর একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে 'অন্তরীক্ষ' নাম দিয়ে একটি ছবি তুলছেন। সমগ্র ছবিটি যাতে সব দিক থেকে সত্যকার বাস্তবধর্মী এবং উচ্চমানের হয় তার জন্য শ্রীযুক্ত তরফদার বিশেষ পরিশ্রম করছেন। এঁর আর একটি পরিচয় হল এই যে, ইনি জে, ওয়ালটার টম্পসন নামক বিজ্ঞাপন-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্ট ডিরেক্টর। আমরা এই নবাগত শিল্পী-পরিচালকের সাফল্য কামনা করি।

॥ ভাদ্র ও আশ্বিন

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে

সন্ন্যাস নিয়ে প্রেমাবেশে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু তিনদিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেছিলেন তখন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতগৃহে তাঁর ভোজন-লীলার একটি চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঃ

সঘৃত-পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত-দুগ্ধ ভরি ধরি॥
দুগ্ধ-চিড়া-কলা আর দুগ্ধ-লক্‌লকি।
যতেক করিল তাহা বহিতে না শক্তি॥
(মধ্যলীলা)

খুব ঘন জ্বালের দুধ, অথবা দুধের পিঠে এই ছিল তৎকালীন বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ খাবার। আর এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ খাবার হ'ল

রসোমালাই

কে, সি, দাশ, প্রাইভেট, লিঃ

কলিকাতা

আবিষ্কারক ঃ রসোমালাই

দেবতার নৈবেদ্য উপাচারে সারাংশ

শুচিতা ও পবিত্রতা

দেবার্চ্চনার সেই আদর্শে, মানুষের নিত্য সেবার

অনবদ্য-উপাদান

কোলে বিস্কুট